KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/4 22/3 22/4 23/2	Year of Publication : Dec 1956 (আষাঢ় ১৩৬৪) (চৈত্র ১৩৬৫) (আষাঢ় ১৩৬৫) ((পৌষ ১৩৬৫)
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা
সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু
পৌষ ১৩৬৫
এক টাকা

[Library stamp]

কবিতা

পৌষ ১৩৬৫

কবিতা

বিষ্ণু দে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর সেন, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দীপক মজুমদার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদ

সফোক্লেসের আন্তিগোনে ... অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
স্তেফান মালার্মের দুটি কবিতা ... প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

পাস্টেরনাখ-এর প্রসঙ্গে ... অমিয় চক্রবর্তী
আধুনিক বাংলা কবিতা ... নরেশ গুহ
উনগারেত্তির কবিতা ... প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

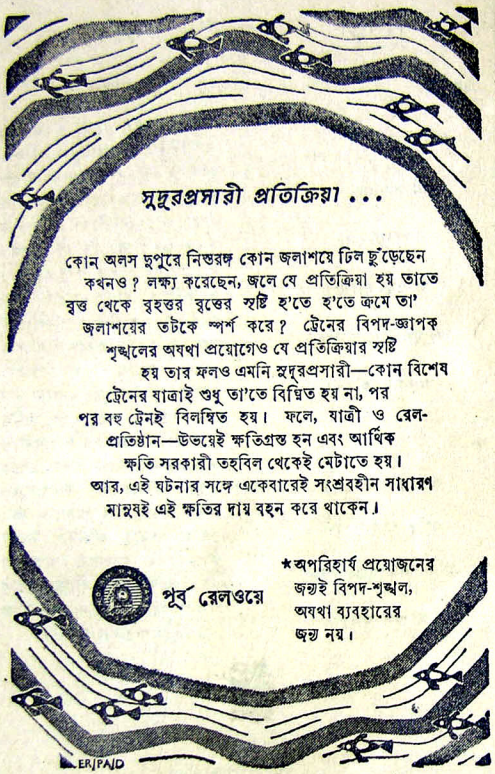

কবিতা
পৌষ ১৩৬৫
বর্ষ ২৩, সংখ্যা ২
ক্রমিক সংখ্যা ৯৬

এ আর ও

বিষ্ণু দে

'স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষাত্মস্বন্নমত্তি।'—ছান্দোগ্য উপনিষদ্

ও ঢাকে সত্যের মুখ হিরণ্ময় হৃদয়ে, আকাশে
সূর্যকে লাঞ্ছিত করে অনৃতের অসুস্থ ধোঁয়ায়,
অস্পষ্ট মানসে দিনরাত্রি ঢাকে শ্মশান-উচ্ছ্বাসে,
কারণ মৃত্যুর মাঠে জন্ম ওর ক্লান্তির রোঁয়ায়।
আর এর দেহমন অক্ষিত, অচ্যুত, নিঃসংশয়;
মৃন্ময়ীর বাহু স্নিগ্ধ ছিল এর জন্মের সময়,
তাই এ অপাপবিদ্ধ; খোঁয়ারিতে ও যবে গোঙায়
এ হাসে, প্রাকৃতজন স্বাধীন কি খণ্ডিত ভঙ্গিতে?
এ জানে কর্ষিত মুক্তি সর্বেন্দ্রিয়ে দু-হাতে আশ্বাসে
মনন যেখানে স্বস্থ প্রত্যহের তৎসৎ বিশ্বাসে:
নিষাদের সংস্কৃতিই মহাকাব্য সীতার গণ্ডিতে।

তাই এ দিনান্তে শ্রান্ত, ঘরমুখো। এর শুধু পেশী
কর্মক্লান্ত, তাই গোধূলিতে গার্হপত্যে ফেরে, ঘুম
ঘর চায়, ঘরনী ও পুত্রকন্যা, অন্নের আরাম।
সূর্যের আরম্ভে তাই এর শুরু স্বচ্ছ প্রতিদিন।
আর ওর ক্লান্তি হ'লো প্রারম্ভিক, আজন্মনিঃঝুম
গোধূলিতে কৃত্য শুরু, ক্লান্তি থেকে কর্ম, ভিন্‌দেশী

বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত, তাই দৈনিক সে দিয়ে যায় দাম
মৃত্যুর মোদক কিনে, জীবনে সে জীবে প্রেমহীন।
স্নায়ুর শূন্যের ক্লান্তি, তাই তার ক্রিয়া অকর্মক
নিরুদ্দেশ, বিভক্তিতে ভুলে গেছে কর্মের কারক।

এতে ওতে মুখোমুখি হ'লে হাওয়া হিম হ'য়ে যায়,
বর্ষায় নির্জলা দেশ, শিশিরে গঞ্জিত নেশা জলে।
ও যবে বক্তৃতা দেয় আধিগ্রস্ত কবন্ধ কৌশলে,
নীলাকাশে মুক্ত এর হাত চলে লাঙলে চাকায়॥

আধুনিক বাংলা কবিতা

নরেশ গুহ

কবিতা লেখাও বরং সহজ কিন্তু কবিতার বিষয়ে লেখা আর অসাধ্যসাধন করা প্রায় এক কথা। বাইরের দিক থেকে বলা যেতে পারে—কবিতার ভাষাটা কেমন, ছন্দ মিলের মধ্যে কোনো কৌশল আছে কিনা, চিত্রকল্পের ব্যবহার কোথায় সার্থক হয়েছে, কিংবা হয়নি। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বর্ণনা করবার মতো কোনো প্রসঙ্গ থাকলে তারও আলগা একটা বিশ্লেষণ হয়তো করা যায় দেখানো যায় কাছের বা দূরের কী ঘটনার ছায়া পড়েছে তাতে, কিংবা পড়েনি; কেমন অনায়াসে সেই সব 'যুগান্তকারী' ব্যাপারকে কবি উপেক্ষা ক'রে গেছেন, কোথাও বা তাতেই আকণ্ঠ মজেছেন। কোন কবির মনের গড়নটা যেন এই রকমের, যদিও ঠিক এই রকমের নয়ও আবার। অনেক কথা জানা যায়, শেখা যায় এ-সব থেকে, শুধু কবিতার হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি নীরব থাকে। অথচ রক্তের স্পন্দনের মতোই নিজের অস্তিত্বকে পৌঁছে দিতে পারাই তো কবিতার লক্ষণ। সে-কাজটা ঠিক কী উপায়ে সম্পাদিত হয় তার কথা, আভাসে ইঙ্গিতে হ'লেও, তাঁরাই ভালো ব্যক্ত করতে পারেন, কোলরিজ বা এলিঅটের মতো যাঁরা নিজেরাও কবি, সেই সঙ্গে ভাবুক।

তার মানে এ নয় যে কবি-সমালোচক ছাড়া আর কারো পক্ষে এ-কাজে হাত দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। বরং এটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নেয়া যায় যে কোনো-না-কোনো সময়ে কবিতার সহৃদয় ও বোদ্ধা পাঠক জুটবেই। আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে, নিজেরা কবি না-হ'য়েও, যাঁরা ইতিপূর্বে সহৃদয় আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও বিমলচন্দ্র সিংহ। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি আলোচনার গুরু দায়িত্ব প্রথম নিলেন শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী, এবং যেভাবে এই দায়িত্ব তিনি পালন ক'রে উঠেছেন তাতে আমরা বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করছি।*

* আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়: দীপ্তি ত্রিপাঠী। নাভানা। ছয় টাকা।

শ্রীমতী ত্রিপাঠী যে-পাঁচজন কবিকে আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা ব'লে বেছে নিয়েছেন—তাঁদের আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু অগ্রজ রবীন্দ্রনাথকে এনেছেন তা নয়, সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য কবিদের কার্যকলাপও তিনি বিস্মৃত হননি। বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ ক্রমেই পরস্পরের এত কাছে এসে পড়ছে যে এ-যুগে আর সব জিনিশের মতো সাহিত্য-শিল্পকেও একমাত্র স্বদেশীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এবং কবিদের মনের গড়ন আর দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে গত একশো বছরের পৃথিবীতে সমাজ, রাষ্ট্র, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা দিকে যে-সব বড়ো-বড়ো পরিবর্তন ঘ'টে গেছে, যে-সব ঢেউয়ের আন্দোলন এসে শিল্পীর চিত্তেও পৌঁছতে বাধ্য, সে-সব কথাও তাঁকে আনতে হয়েছে। অবশ্য এমন দাবি যদি আমরা করি যে কবিতা পড়তে গেলে পাঠককে আরো দশটা গুরুতর বিষয়ে জ্ঞানী হ'তে হবে, তাকে বুঝতে হবে রোমান্টিকের 'কল্পনা' বিষয়টা কী, লক্-এর দর্শন কী বলে, জানতে হবে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-তত্ত্ব, নক্ষত্র আর নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণা, জড়বাদের বিপর্যয়কাহিনী এবং ফ্রান্সের প্রতীকী আন্দোলন, ইমেজিস্ট-সুররিয়লিস্টদের ক্রিয়াকলাপ, ইম্প্রেশনিস্টদের শিল্পচিন্তা এবং মার্ক্সীয় ইতিহাসচেতনা এবং ইত্যাদি-ইত্যাদি, তাহ'লে সংগত কারণেই ভাঙা আসর আরো খালি হ'য়ে যাবে। আসলে যে-যুগে আমরা বাঁচি সে-যুগের হাওয়া থেকেই এ-সব জিনিশ আমরা অল্পবিস্তর পেয়ে যাই। সেটা যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না, যাঁরা এই সবের মধ্যে থেকেও যেন নেই, কোনো তোলপাড় হুলুস্থুলই যাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না, এ-যুগের কবিতা প'ড়ে অর্থোদ্ধার করতে হ'লে খানিকটা তৈরি তাঁদের হ'তেই হবে। 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।'

আধুনিক কবিতা জটিল—এ-অভিযোগটা যেমন পুরোনো তেমনি টেকসই। তাহ'লেও এ-বিষয়ে দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। জটিলতাই যার একমাত্র গুণ সে-জিনিশ কবিতা নাও তো হ'তে পারে। তাছাড়া এ-গুণটা শুধু সাম্প্রতিক কবিতারই অপূর্ব উদ্ভাবন নয়। চিরকালই কিছু-কিছু কাব্য জটিল থেকেছে,

আবার প্রথম পাঠের ফলেই অভিভূত হ'তে হয় এমন কবিতারও অভাব নেই এ-কালে। তার চাইতে, আধুনিক কবিতা কাকে বলে, সে-কথাটা বেশি জরুরি। কোনো-এক বিশেষ তারিখের পর থেকে লেখা কবিতা মাত্রেই যে আধুনিক নয় সে-কথা শুধু এই থেকেও অনুমান করা যায় যে লেখিকা তাঁর আলোচনার জন্য অনেকের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে বেছে নিয়েছেন। তিনি ঠিক কোনো সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন বলবো না, কী-কী লক্ষণ আধুনিক কাব্যে দেখা যায় তিনি তার একটা তালিকা করেছেন। বলেছেন :

১। কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী।
২। ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।
৩। সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।'

ভাব অবশ্য কবিদের নিজের হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সেটা কথা নয়। কিন্তু আধুনিকদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের কবিতার পার্থক্য এতই প্রকট, মেজাজ এবং রীতির দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে অমিলের তুলনায় মিলটা এতই কম চোখে পড়ে যে এ থেকে কোনো সামান্য লক্ষণ খুঁজে বার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। উপরোক্ত লক্ষণ তিনটি এতই অস্পষ্ট যে তা আমাদের জিজ্ঞাসাকে শান্ত করে না। লেখিকা নিজেও সে-কথা জানেন, তাই তিনিও শুধু ঐ কথা ব'লেই ক্ষান্ত হ'তে পারেননি। কথাটা আরো বিশদ, আরো যথাযথ করতে গিয়ে বলেছেন, ভাবের দিক থেকে বারোটি এবং আঙ্গিকের দিক থেকে বারোটি লক্ষণ আধুনিক কবিতায় বর্তমান। উপরন্তু যোগ করেছেন যে 'রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস' বলতে বুঝতে হবে 'আধুনিক কবিদের বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে।'

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অবশ্য জটিল হ'য়ে গেলো। নতুন লেখা থেকে আধুনিক কবিতাকে বেছে নিতে গেলেও এ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সংজ্ঞার্থমাত্রেই সংক্ষিপ্ত হয়, এবং সেই পরিসরের মধ্যে একমাত্র সামান্য লক্ষণেরই স্থান হতে পারে। ভাবের দিক থেকে দ্বাদশ লক্ষণের সবগুলি প্রতিটি আলোচ্য কবির রচনায় নেই। আমি অন্তত অমিয় চক্রবর্তী

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় 'রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহে'র কোনো নমুনা আছে ব'লে জানি না। 'বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ'ই বা বিষ্ণু দে-র পরবর্তী রচনায় অথবা অমিয় চক্রবর্তীর সমগ্র কাব্যে কোথায় মিলবে? লেখিকা, স্পষ্টতই, যাঁর-যাঁর বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেছে একত্র করেছেন, তা না-হ'লে 'মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নূতন সমাজসৃষ্টির আশা'কে ভাবের দিক থেকে আধুনিক কাব্যের অন্যতম লক্ষণ ব'লে ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা হ'তো। কেননা এঁদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র রচনায় এই ধারণার সঙ্গে সাক্ষাৎ মেলে।

তাহ'লে কি বিচিত্র সুরের সাধনা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে একমাত্র মিল হচ্ছে কলাকৌশলের বিশিষ্টতায়? মনের দিক থেকে কোনো মিলই নেই? অথচ প্রসঙ্গ আর রূপের মধ্যে হরপার্বতীর মিলন যদি না-থাকে, রূপটা যদি ধার-করা হয়, পোষাকি হয়, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়—তাহ'লে যতই জমকালো রূপসী দেখাক না কেন, তাকে আমরা কবিতা বলবো না। আধুনিক কবিতার আঙ্গিক বা রূপের মধ্যে কোনো মৌলিক সাদৃশ্য যদি থাকেই, আগেকার কবিতা থেকে ভিন্ন হ'লেও তার উপযোগিতার কথা যদি মেনেই নিই আমরা, তাহ'লে এই কবিদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো চারিত্রিক মিলও আছে। সে-মিলটা মনে-মনে আমরা জানি না তা নয়, কিন্তু ভাষায় বলতে গেলেই বিপদ দেখা দেয়।

একটা বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই আধুনিক কাব্যের নান্দীপাঠ শুরু হয়েছিলো, সে-কথা ঠিক। তখনকার মতো সে-বিরোধিতার উপলক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে একটা আস্ত যুগ। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক উপলক্ষ মাত্র, আধুনিকেরা তাঁকে কোনোকালেই যে পরিহারের চেষ্টা করেননি, বরং শিরোধার্য ক'রে নিয়েছেন, তবে প্রমাণ 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংকলনগ্রন্থ। তবে প্রাক্তন এবং আধুনিকের চোখে দেখা রবীন্দ্রনাথের চেহারায় হয়তো বা মিল নেই। সে যা-ই হোক, জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে গভীর কোনো পরিবর্তনের সূচনায় খানিকটা বিদ্রোহের হাওয়া দিয়েই থাকে।

কিন্তু নতুনের আদর্শ একবার যখন প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায় তখন থেকে তার নিজের মূল্যেই তার পরিচয়। কাজেই রবীন্দ্র-বিরোধিতাও আধুনিক কবিতার কোনো সামান্য লক্ষণ ব'লে মানবো না।

আমরা কি তাহ'লে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'আধুনিকের বিদ্রোহ রোমান্টিকের বিরুদ্ধে'? অর্থাৎ আধুনিক কবিতা রোমান্টিক নয়? দুঃখের বিষয় জীবনে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার অন্ত নেই, কিন্তু অভিধানে শব্দের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে পরিমিত। বিশেষত 'রোমান্টিকে'র মতো গুণবাচক শব্দগুলিকে, বিকল্পের অভাবে, এত রকমের ভিন্ন এবং বিরোধী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাদের সাহায্যে ঠিক-ঠিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করা আজ প্রায় অসম্ভব। রোমান্টিক আর ক্লাসিকল বলতে দু'জন লোক একই জিনিশ বোঝেন কিনা সন্দেহ। উনিশ শতকী ইংরেজ কবিরাই রোমান্টিক প্রতিভার একমাত্র প্রতিভূ, রোমান্টিক চেতনার সবগুলো উল্লেখযোগ্য গুণই তাঁদের কাব্যে আছে—এই রকমের একটা ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল। রোমান্টিক কাব্যের মূলসূত্র যদি "imagination" ['ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান এই বস্তুজগতের সীমার অন্তরালে এক অসীম রহস্যময় অলৌকিক জগৎ বিদ্যমান। কল্পনা প্রতিভার সহায়তায় কবির কাছে সে-জগৎ প্রত্যক্ষ হয়। কবি সেই দর্শনের বিস্ময় কাব্যে রূপায়িত করেন।' ১৬ পৃঃ], তাহ'লে বায়রন রোমান্টিক কিনা? এবং তার আগে শেক্সপীয়রকেই বা কোন দলে রাখবো? আলোচনা থেকে বোঝা যায় শ্রীমতী ত্রিপাঠী রোমান্টিসিজম্-এর উনিশ শতকী ইংরেজি ধারার কথা বলছেন। কিন্তু তার বিরোধিতা ক'রেও যে রোমান্টিক থাকা যায় সেটা গণ্য করেননি ব'লে তাঁকে বলতে হয়েছে:

"কি ক্লাসিক, কি রোমান্টিক, প্রেমের আদর্শে 'বন্দীর বন্দনা'-র কবির বিশ্বাস নেই" —৯৭ পৃঃ

"বস্তুত রোমান্টিক-বিরোধী হ'লেও সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে ক্লাসিক আদর্শ নেওয়া সম্ভব ছিলো না, যুগধর্ম তার বিরোধী।"

"'পরস্পর'-এ সেই অচরিতার্থতার বেদনার অন্তরালে নূতন এক অনুভূতি বা বোধের জন্ম হচ্ছে দেখি। রোমান্টিসিজমের যুগ শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, রিয়ালিজম ফিরে আসছে; আবার রিয়ালিজমের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আর এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলব্ধি হচ্ছে, তা হ'লো সুররিয়ালিজম বা অতিবাস্তব চেতনা"। —১৯৬ পৃঃ

ক্লাসিক সাহিত্যের সুমিতি আর শৃঙ্খলাবোধ অনেক পরিমাণে আয়ত্ত করা গেলেও সমাজের মানুষরা যে-কালে তাদের বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণায় শতধা বিভক্ত, বিশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবির নিজেকেই যেখানে বাধ্য হ'য়ে একটা কোনো শৃঙ্খলা বানিয়ে নিতে হয়, সে-পরিবেশে ক্লাসিক সাহিত্যের উদ্বর্তন অভাবনীয়। ক্লাসিক সাহিত্যে বিদ্রোহ নেই, শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার কেউ স্বীকারই করেন না। প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণা এবং শিল্পরীতিকে তাঁর নাটকে পুরোপুরি মানতে পারেননি ব'লে রোমান্টিকের ছোপ-লাগা ইউরিপিডিসকে আথেন্স ছেড়ে পলাতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত প্রবাসেই তাঁর জীবন সাঙ্গ হয়। আমার ধারণা, এলিঅট নতুন এক ক্রিশ্চান সমাজের প্রতিষ্ঠা চান এই কারণে যে, তাঁর মতে, শুধু সেই ধরনের পরিবেশেই নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জন্মাতে পারে, যার ফলে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতে শক্তি এবং কালক্ষয় না-ক'রে শিল্পীর পক্ষে তাঁর আসল রচনাকর্মে মনোনিবেশ করা সহজ হ'য়ে যাবে, শিল্পে ক্লাসিকাল যুগ ফিরে আসবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এ-রকমের ঐক্যবোধ এ-যুগে সোভিয়েট রাশিয়ার মতো দেশেই বোধ করি থাকা সম্ভব। রোমান্টিক শিল্পীর অভ্যুদয় সেখানে ভাবা যায় না। তাই মানুষের অপরাজেয় হৃদয় যদি কোনো বরিস পাস্টেরনাকের মধ্যে আকাশের দিকে হাত তোলে, তাহ'লে সমাজের দিক থেকে তাঁর হঠকারিতার প্রতিবিধান করতে তৎপরতার অভাব হয় না।

কথা হচ্ছে, এক যুগের রোমান্টিক মনোভাব যখন কালক্রমে অন্য যুগে এসে দুর্মর অভ্যাসের অন্তঃসারশূন্যতায় পর্যবসিত হয় তখন তার প্রবল বিরোধিতা করার পরেও কবি মনে-প্রাণে রোমান্টিকই থাকতে পারেন। কারো-কারো রচনায় ক্লাসিক গুণ বর্তানো অসম্ভব নয়, যেমন সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাতে কিছু এসে যায় না। আধুনিক কবিমাত্রেই রোমান্টিক ধারারই অনুশীলন করছেন। তবে তার পরিধিকে যদি তাঁরা বাড়িয়ে থাকেন সেটা তো গৌরবের কথা। 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গেল যে পূর্ব পুরুষের অনন্ত শোষণে কাব্যের কলেবর থেকে অর্থ ও আবেগের মজ্জাটুকু শুকিয়েছে, প'ড়ে আছে শুধু কঙ্কাল—প্রতিধ্বনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে প'ড়ে আছে শুধু দীর্ণ, জীর্ণ, বৈশিষ্ট্যহীন কঙ্কাল।.....

.....ফলে কোনও সৎ কবিরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে সে-ফাঁকির মধ্যে সত্যের শৃঙ্খলা আনতে গেলে, আড়ম্বরের মোহ অবশ্য পরিত্যাজ্য, অন্তঃসারশূন্য বস্তুমাত্রার আমূল উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। কেন না শুধু নূতন অট্টালিকার নির্মাণে কোনও সার্থকতা নেই; হর্ম্যখানাকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করা চাই, দেখা চাই যাতে আকাশের আলো তার ভিজে দেওয়ালে বাধা না পায়, বিশ্বের বাতাস ফিরে না যায়, তার অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে। সেজন্য একটা নগণ্য বাহ্য সৌন্দর্যের দিকে নজর রেখে ইটের পরে ইট সাজানো যথেষ্ট নয়, বাড়িতে যারা থাকবে তাদের ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্ত মাংসে গড়া, দুঃখ-আনন্দের দাস, পরিবর্তনশীল, বর্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জনীয় ঠেকে, তবে তাই স্বীকার; তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অবৈকল্য, দ্বিতীয় দফার দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, এবং শেষের দফায় দরকার অবৈকল্য। **বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা।**'.....

.....সময়রূপ চতুর্থ আয়তনের মার্গে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ না মিলতে পারছে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন। সেইজন্য প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না, এবং কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।'.....

তার মানে, বিশ শতকে লেখা যে-কবিতায় অবৈকল্য, অকপটতা আর কালজ্ঞানের পরিচয় আছে তাকেই বলবো আধুনিক কবিতা। অকপট ব'লেই এ-কথা মানতে আধুনিক কবির কোনো দ্বিধা নেই যে মানুষ দুর্বল। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও তিনি স্বীকার না-ক'রে পারেন না যে এই পরমাশ্চর্য জীবনের রহস্য শেষ হবার নয়। অলৌকিক বৃন্দাবনী গোষ্ঠে চিরস্থায়ী প্রেমের লীলা তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না বটে, কিন্তু প্রেমের অপরিসীম শক্তি আর মহিমায় তাঁর আস্থা নেই বললে কথাটা মনগড়া হবে, কবিতায় তার প্রমাণ মিলবে না। অন্ধকারকে স্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা আলোকের আশীর্বাদকে অস্বীকার করেন না। এবং বিজ্ঞান তার প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘায়ে একে-একে মানুষের সব কিছু প্রচলিত মোহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেও কবিকে দমাতে পারেনি। সৌন্দর্যের দরজা আগলিয়ে এখনো কবি দাঁড়িয়ে আছেন। দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থেরই ৩৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি, যাতে তিনি নিজের কবিতার কথা বলছেন :

'পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেলো তার **বিমিশ্র** সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিন্তু সব বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে-দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতোধ্বনি, আশ্চর্য রঙিন কাহিনী যা দেখা-শোনা যায় না।'

আধুনিক কবি কোনোদিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন না :

দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।

প্রেম, প্রকৃতি বা ঈশ্বর বিষয়ে আধুনিক কবি পূর্বেকার প্রচলিত ধারণাকে ছেড়ে দিয়েছেন ব'লেই শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেননি। 'বন্দীর বন্দনা'য় প্রেম আর সৌন্দর্যের উপলব্ধি অতিমাত্রায় তীব্র ব'লেই কবিতায় কোথাও ক্রোধ, কোথাও বা বিদ্রূপের সুর লেগেছে। সে-কবিতায় অভিমান আছে, আত্মগ্লানি আছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চিহ্নও সর্বত্র। 'চর্ম সাথে চর্মের ঘর্ষণ একমাত্র সুখ যাহাদের' তাদের সঙ্গে প্রেমিক প্রেমিকাকে কবি এক ক'রে দেখেননি। অথচ তারাও আছে। এবং তাদের সংখ্যাই বেশি। সতী-সাবিত্রীকে ব্যঙ্গ করতে কবির সুদূরতম অভিপ্রায় ছিলো ব'লে মনে করি না। বিদ্রূপের তাঁরাই লক্ষ্য যারা সতীসাবিত্রী-শকুন্তলার দোহাই দিয়ে জৈব কামনার চরিতার্থতা খোঁজেন। 'বন্দীর বন্দনা'য় নবযৌবনের ঔদ্ধত্য যে কত প্রকট তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'প্রেমিক' কবিতা। প্রেম এতই পবিত্র যে কোনো পার্থিবার পক্ষে সেই পবিত্রতীর্থে সহযাত্রী হওয়া যেন দুরাশা মাত্র, এটাই হচ্ছে কবির বলার কথা। সে শুধু আধার, এবং সে-আধারে প্রেমের আবির্ভাব একমাত্র প্রেমিক-কবির পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অথচ এই অসমর্থ নায়িকাকেই পরে কঙ্কাবতীতে রূপান্তরিত দেখে আমরা অবাক হই না। সেই পার্থিবার মুখেই তখন সকল রূপকথার, গ্রীক পুরাণের, স্বদেশ-বিদেশের নানা কালের কাব্যে কীর্তিত নায়িকার লাবণ্য এসে মিশেছে। নায়িকাতেই মূর্ত হয়েছে প্রেম, আর শেষ পর্যন্ত প্রেমেই কৈবল্য। কাজেই "কি ক্লাসিক, কি রোমান্টিক,

প্রেমের আদর্শে 'বন্দীর বন্দনা'র কবির বিশ্বাস নেই'—বললে কবির প্রতি সুবিচার হয় না।

গ্রন্থে এই রকম আরো কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত আছে যার সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারিনি, যেমন জীবনানন্দ বিষয়ে তিনি বলেছেন : 'সত্যের অন্বেষায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে প্রত্যক্ষ ক'রে লাভ করেননি। এজন্য তাঁর কাব্যের ট্র্যাজিক মহিমা এত বেশি মর্মভেদী'। কিংবা, 'রোমান্টিক কবিদের শাশ্বত প্রেমের আদর্শে জীবনানন্দের বিশ্বাস নেই।' অথবা, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'অচরিতার্থতার কাব্য'। কীটস-এর বহু-আলোচিত সেই পংক্তিটি থেকেই এই রকম একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে কবি সত্যদ্রষ্টা। তাহ'লে মানতে হয় যে দার্শনিক আর কবির উদ্দেশ্য অভিন্ন। অথবা 'সত্য' কথাটা স্থানভেদে তার অর্থ বদলায়। এলিঅট বা রিচার্ডস-এর মতো অনেকেই কীটস-এর ঐ উক্তিটি নিয়ে সুখী হ'তে পারেননি। এবং প্রচলিত অর্থের বিভ্রাট না-ঘটিয়ে কিংবা প্লেটোর জগৎকে পুরোপুরি অস্বীকার না-ক'রে নিলে ও-কথার সত্যি কোনো অর্থ হয় না। কবির উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান নিশ্চয়ই নয়, উপলব্ধি আর উক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিমা নির্মাণই তাঁর অভীষ্ট। উপলব্ধিতে যদি কপটতা না-থাকে তাহলেই হ'লো, লোকাচারের সঙ্গে মিলছে কিনা সেটা কথাই নয়।

'শাশ্বত প্রেম' বলতেই বা কী বোঝায় ? প্রেম শাশ্বত, এ-কথা সবাই মানবেন। কিন্তু জীবনে তার আবির্ভাব ক্ষণস্থায়ী। তার জন্য প্রতীক্ষার অন্ত নেই, এবং প্রেম চ'লে গেলে প্রেমের স্মৃতিমন্থন, কিংবা তার যন্ত্রণা সহ্য করা—এই তো চিরকালের অভিজ্ঞতা। চিত্রিত, অথবা ভাস্কর্যে-উৎকীর্ণ, নরনারীর পক্ষেই শুধু অক্ষয় প্রেম সম্ভোগ সম্ভব। জীবনানন্দের কাব্যে এই শাশ্বত অভিজ্ঞতার কথাই আছে যে প্রেমের চূড়ায় যত ক্ষণকালের জন্যই দাঁড়াই না কেন, তা আমাদের অন্য জন্মে উত্তীর্ণ ক'রে দেয়।

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালার্মে-র এবং অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে লেখিকা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'মালার্মের

প্রতি সুধীন্দ্রনাথের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ তাঁর দুরূহতা, সংহত স্বল্পভাষ ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলী, শব্দের অভিধানগত অর্থের বিনষ্টি এবং সর্বোপরি তাঁর বিষণ্ণ নেতিবাদী জীবনদর্শন'। উভয়ের কবিতাই দুরূহ; কিন্তু দুয়ের দুরূহতা কিন্তু দুই জাতের, কবিস্বভাবেও চোখে পড়ার মতো মিল নেই। তবু মালার্মের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অনুরাগ এত প্রবল কেন সে-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর লেখিকার আলোচনা থেকে আমি জানতে পারলাম না। আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা যে আধ্যাত্মিক, সে তো তিনিও মানেন। রবীন্দ্রনাথের "মিস্টিক" বোধ নিশ্চয়ই অন্য রকমের, কিন্তু তার জন্যে এ-কথা বলা যায় না যে **"আপাতদৃষ্টিতে"** মনে হ'তে পারে তিনি এ যুগের প্রধান আধ্যাত্মিক কবি।" "আপাতদৃষ্টিতে" কেন, নিকট দৃষ্টিতেও তিনি আধ্যাত্মিক।

আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে লেখিকার সিদ্ধান্ত কোথাও-কোথাও আমার সঙ্গে মেলে না ব'লে এ-গ্রন্থের মূল্য কিছুমাত্র কমছে না। নির্বাচিত কবিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা, ও সন্ধানশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিস্বভাবের সঙ্গে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হপকিন্স, রিল্‌কে আর ওয়ালেস্ স্টীভেন্স, আর বিষ্ণু দে-রসঙ্গে লোর্কা, আরাগঁ এবং পল এলুয়ারের তিনি যে-সব মিল আবিষ্কার করেছেন তা থেকে এই সব কবিদের নতুন ক'রে পড়ার সময় নিশ্চয়ই আমরা লাভবান হবো। আধুনিক কবিতা তাঁর পক্ষে শুধু কৌতূহলের সামগ্রী নয়। বাধ্য হ'য়ে পড়েননি, ভালোবেসে পড়েছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মনোভাব ঠিক পূজারিনীর মতো নয় ব'লে এ-যুগের কবিতা তাঁর কাছে পরধর্মের মতো ভয়াবহ মনে হয়নি। তাঁর লেখার প্রধান গুণ এই যে অন্য অনেক বাংলা সমালোচনার মতো তাঁর লেখাকে তিনি আপ্তবাক্যের চর্বিতচর্বণে ভ'রে তোলেননি। তিনি যে নিজে চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ এই যে আমাদের দিয়েও পদে-পদে তিনি ভাবিয়ে নেন। এ-লেখা প'ড়ে মন চুপ ক'রে থাকে না। তিনি প্রশ্ন জাগাতে পারেন। এ-কালের বাংলা কবিতায় যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা

প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে লেখা এই প্রথম বিস্তারিত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই।

আলোচিত কবিতাংশের উপযুক্ত অনুবাদ সমেত এ-বইয়ের কোনো সংক্ষিপ্ত সার যদি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় তাহ'লে বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের পক্ষেও এ-কবিতা পড়ার পথ সুগম হবে। এই আধুনিক কবিতার মধ্যেই আমরা এ-যুগের বাঙালি হৃদয়ের অকপট ভাষা শুনতে পেয়েছি। লেখিকা দেখিয়েছেন, কেমন অংসকোচে পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের পাশে বসিয়ে তাকে উপভোগ করা যায়। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র হালের জাপানি সাহিত্যই যদি পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়ে থাকে সেটা বাংলার তুলনায় সে-সাহিত্য অগ্রসর ব'লে নয়, তার কারণ তাদের ভাগ্যে ভালো অনুবাদক জুটেছে।

৩২ পৃষ্ঠায় বোদলেয়ার-এর সনেট থেকে মাত্র ৮ লাইন তোলা হ'য়েছে, যদিও সঙ্গের বাংলা অনুবাদটি পুরো কবিতার। পরবর্তী সংস্করণে ফরাসী উদ্ধৃতিগুলির স্থানে-স্থানে বানান ঠিক ক'রে দেওয়া প্রয়োজন। ২৭ পৃষ্ঠায় বর্নট্ নর্টন্ কবিতার উদ্ধৃতিতে ভুল আছে। The Second Coming এবং The Coming of Wisdom with Time কবিতার উদ্ধৃতিতে কয়েকটি কমা সেমিকোলন ছাপা না-হওয়ায় অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়।

প্রেম, পুনর্বার

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

হে আস্বাদিত দুঃখ, তুমি বাম পার্শ্বে বোসো
আর এই সুমঙ্গলা রমণী দক্ষিণে ;
আমি মধ্যবর্তী থাকি, কথা বলো তোমরা দুজনে
কলহ কোরো না, ঊর্ধ্বে গোধূলির আলো বড়ো নির্জনতাপ্রিয়।

তোমার নিরালা মুখ বলো দুঃখ কে কাঁদালো কলহে, কণ্টকে।
জানি, নারী সুমঙ্গলা, হিংসা ওর বুকের প্রিয়তা ;
কাম্য শান্তি তাই ভাবি, বিবাদে ক্ষরিত রক্ত, বিবাদ ভালো না
আনো মুখ দৃশ্য মুছি, গোধূলির আলো বড়ো নির্জনতাপ্রিয়।

শোনো, সহ্য করো এই রমণী দক্ষিণে বামে দুই হাতে আমাকে জড়াবে,
হিংসুক সমস্ত চায় ;—
বলে, প্রেম উদারতা থেকে আরো অধিক যুবতী।
বিলাপ কোরো না, দুঃখ, তুমি বাম পার্শ্ব থেকে বুকে এসে বোসো।
কলহে কণ্টক, ঊর্ধ্বে গোধূলির আলো বড়ো নির্জনতাপ্রিয়।

সংশয়

প্রভাকর সেন

বিকালে ধুলোর ঝড়, ঘোলাটে আকাশ,
ছেঁড়া কাগজের গলি, কানা রাজপথ,
ন্যাকড়াজড়ানো তাজা হৃৎপিণ্ডবৎ
শেয়ালদার ত্রিসীমানা, চারটে আটাশ।

ক্রমশ নিস্তেজ হ'লে শব্দের জঙ্গল
চ'লে যায় নৌকা নিয়ে ভাঙরের খাল,
দ্রুত জলা, কাদামাখা মহিষের পাল,
দুয়েকটি ভাঙা ঘাট, ছায়াচ্ছন্ন জল।

হৃদয়পুরের পথ এ-সবের পর
অন্ধকার আকাশের যেন খুব কাছে,
জোনাকির মতো যেন তারা গাছে-গাছে,
কোথা যেন নিদ্রাতুর শিশুদের স্বর।

বুঝি নাকো আলো হাতে দোর খুলে দিলে
আছো নাকি তত দূরে, যত দূরে ছিলে।

শিল্পী

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আকাশে সে দৃশ্য গড়ে
মাটিতে ফোটায় শতদল,
তার নামে, বনান্তরে
দক্ষিণের রটনা চঞ্চল।

সূর্য, দিনে ছায়া লোটে
রাত্রি রচে আত্মার মহিমা,
দুঃখ তাকে দেহ দিলে

মন ভাঙে সম্ভবের সীমা ॥

সফোক্লেস-এর আন্তিগোনে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আন্তিগোনের গান

স্থায়ী : এক

হেরো গো আমারে আমার স্বদেশবাসী,
জলের মতো এই পথ যাবো ছেড়ে,
হেরিব না আর সূর্যরশ্মিরাশি,
দিন চ'লে গেলো, সব নিয়ে গেলো কেড়ে।
নিদ্রাঞ্জনে হাইদাস মোর নয়নের জ্যোতি গ্রাসি'
উপহার দেবে এ-জীবন মোর তুহিন সৈকতেরে,
আকেরন লবে বৈতরণীর ঢেউয়ের বাহুর ঘেরে,
এ-দেহ আমার। মিলনগীতিকা কখনো শুনিনি যে রে,
আকেরন মোরে মরণে জড়াবে, পরাবে প্রেমের ফাঁসি ॥

সংস্তব

তুমি চলো, চলে গৌরব পিছু-পিছু,
তুমি মৃতদের বন্দীভবনে চলো,
ত্রিতাপতৃষ্ণা তোমার চরণে নিচু,
অসির উপরে গরীয়সী তুমি জলো,
নিজ নিয়তির নায়িকা, মৃত্যু দলো,
সমাধির পানে একা চ'লে যাও ঋজু ॥

আন্তিগোনের গান

অন্তরা : এক

সেই যে করুণ বিজন তান্তালস
আত্মজা তার নিয়োবি নাম্নী ফ্রিজিয়াবাসিনী বালা
সিপুলস ব'লে পাহাড়চূড়ায়, সহিল মরণজ্বালা ;

পাথরে-পাথরে নিথর হ'লো সে-ব্রততী-জীবন-রস।
বেয়ে-ওঠা সেই লতার উপরে বছর-বছর ধ'রে
বৃষ্টিতুষার, সে রইলো নিচে প'ড়ে,
বৃষ্টিতুষার-অশ্রুপ্লুতা দেহবল্লরী ভ'রে ;
আমারও তো সেই দুর্ভাগিনীর পালা,
আমিও ঘুমাবো শিলাশয্যায় তারি মতো ঘুমঘোরে ॥

সংস্তব

দেবতার ঘরে জন্মেছিলেন তিনি,
মোরা নশ্বর, মৃন্ময় পরিণাম,
তুমি যে তরুণী ইহলোকে শরীরিণী,
জীবনে মরণযন্ত্রণা লভি' দেবী তবু তোর নাম।

আন্তিগোনের গান

স্থায়ী : দুই

শাস্তি দেবে না, কৌতুক করো অভাগা নারীর মনে ?
পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের নগরদেবতা যতো,
দেখুন আমায়, নির্জিতা আমি কথার নির্যাতনে,
এখনো তো বেঁচে, মরিনি শেষ মরণে,
ম'রে গেলে মোরে মুখের উপরে কোরো ক্ষতবিক্ষত।
ওরে ও আমার রত্নানগরী, নরনারী নগরীর,
ওরে ও আমার দির্কা নদীর নদীনীর, নদীতীর,
থেবা নগরীর রথের পথের অরণ্য ছায়াঢালা,
তোমরা ভুলো না অপঘাত মোরে সাজা দিলো অকারণে,
মিললো না কোনো সমবেদনার সখ্য নয়ননীর,
মাটির তলায় গহন নিরালা
পাথরের গড়া সমাধি-কারায় চলেছি অবরোহণে,
জীবনে অথবা মরণে কোথাও পাবো না আপন নীড় ॥

সংস্তব

স্থায়ী : এক

ওরে মেয়ে, তোর সামনে গভীর খাদ,
দুঃসাহসের শিখরে আছিস রত,
বিচারের বেদী অদূরেই উদ্যত,
পিছনে পূর্বপুরুষের পরমাদ।

আন্তিগোনের গান

অন্তরা : দুই

সেই তো আমার ভীষণ অসহ ভার,
পুরোনো ব্যথার সে-কাহিনী তিন বার
বলা হ'য়ে গেছে, তবু কি হ'লো না বলা ?
প্রাচীন রাজার পাতকের অধিকার,
দুর্ভাগা পিতা, অভাগিনী মাতা তামসী রজস্বলা,
কী অভিশপ্ত দয়িত যে তার আপন জঠর থেকে
অকালে উঠলো জেগে।
হায় সে কেমন জনকের সংসার
যে-ঘরে আমার জন্ম যন্ত্রণার,
এখন মাটির নিচে সেই ঘর, ফিরে চলি সেইখানে
একাকিনী আর অবলুণ্ঠিতা, স্বজনসন্নিধানে
ফিরে যাই আমি। নিজ ঘরনীর ঘূর্ণিবিপাক লেগে
মৃত মোর ভাই মৃত্যুতিমির থেকে যে আমারে টানে ॥

সংস্তব

যোগ্যজনেরে অর্চনা দেয়া ভালো,
নিয়তিশক্তি অনতিক্রমণীয়,
বিশ্বভুবন তার কাছে নমনীয়,
নিজ ইচ্ছায় নেভালে আপন আলো।

আন্তিগোনে

আমি চলি একা আপন বেদনা ল'য়ে
আমি চলি একা দুঃখরুগ্নহৃদি,
কোনো সঙ্গীর মধুমঙ্গলগীতি
ধ্বনিল না, কেউ এলো না অশ্রু ব'য়ে।
মোর ভালে দিন উঠবে না র'য়ে-র'য়ে,
মোর ভালে শুধু আমার পথের বিধি।

[ক্রেয়োনের প্রবেশ]

ক্রেয়োন। কান্না কিংবা মায়াকান্না অকারণ অরণ্যে রোদন,
এ শুধু অবধারিত মৃত্যুর আগেই আয়ুক্ষয়,
যাও, ওকে নিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে,
কবরের গর্তে শক্ত ক'রে ওরে বদ্ধ ক'রে রাখো,
যেমন বলেছি, ঠিক সেই ভাবে। একা ছেড়ে দাও,
মরুক বাঁচুক কিংবা বেঁচে ম'রে থাক অন্ধকারে,
ওর যে-রকম সাধ। আমরা তো সংস্পর্শ এড়াবো!
মোট কথা, মাটির উপরে ওকে থাকতে দেবো না।

আন্তিগোনে। আমার সমাধি সে যে মিলনবাসর। ও আমার
চিরন্তন কারাগৃহ। অবনম্র নববধূসাজে
যেখানে আমার সব পরিজন রাজে সেইখানে
অভিসারে চ'লে যাবো, পের্সিফোনে সেখানে সবারে
অসংখ্য মৃতের সাথে রেখেছেন অতিথিসদনে।
তাঁর প্রাসাদেই আমি যাবো সবশেষে, সবচেয়ে
ভাগ্যহীনা আমি, যাবো দিন ফুরানোর কতো আগে।
যাবার আগেই তবু মনে-মনে আশা লাগে বড়ো—
মা আমাকে হাসিমুখে বুকে নেবে, স্মিতমুখে পিতা,
ভাই কাছে এসে ধরবে। ওরে ভাই, সেই ভরসায়

দুই হাতে আমি তোর মৃতদেহ পরিচর্যা ক'রে
দিয়েছি তো সায়ন্তন শান্তিজল। আর এইবার
পোলুনাইকেস, তোর মৃতদেহ পরিচর্যা ক'রে
এই কি রে সমুচিত পুরস্কার তার? সুধীজন
পুণ্যময় এ-পাপের মর্ম জানে। কিন্তু আমি জানি,
যদি আমি সন্তানের মা হতাম, অথবা আমার
স্বামী যদি যুদ্ধহত বিপর্যস্ত হ'য়ে রইতো প'ড়ে,
সেই সন্তানেরে কিংবা সেই দয়িতেরে কখনোই
রাজরোষ তুচ্ছ ক'রে দিতুম না সমাধি এমন;
কারণ জিজ্ঞাসা করো? শোনো, তবে অন্য একজন
স্বামীকে বরণ ক'রে তাঁর কাছে সন্তান না-হয়
চাইতাম, তিনি তা-ই দিতেন আমাকে। কিন্তু ছাখো,
মা-বাবা দুজনে মৃত, সমাধির মাটিতে প্রোথিত,
একটি ভাইয়ের ডাল হবে আর কোন বৃক্ষমূলে?
তোমাকে সম্মান দিতে গিয়ে তবু ক্রেয়োনের চোখে
প্রতিপন্ন হলাম যে আমি ঘৃণ্য—ভাই, ওরে ভাই,
আমার উপরে তিনি ক্রূরহস্ত। বধূ-মা অথবা
বধূরে যেমন ক'রে নিয়ে যায়, সেইমতো নয়,
আমাকে চালান তিনি রুক্ষভাবে। আমি কারো বধূ
নই, কারো মাতা নই, বন্ধু নই কারো, আমি একা,
তবু বেঁচে আমি, তবু বেঁচে থেকে পাতালে আমায়
যেতে হ'লো। বলো কোন দেবতার দিব্য অধিকার
লঙ্ঘন করেছি? বলো কী ক'রে আমার দুঃখদিনে
ঊর্ধ্বে মুখ তুলে ধরি? কার কাছে দৈব দয়া চাই?
পবিত্র কাজের পরে অশুচি আমার পরিচয়!
স্বর্গের শাব্যস্ত যদি এই হয়, তবে আমি পাপী,

এ-শাস্তি আমারি প্রাপ্য। ওরাই শাব্যস্ত যদি হয়,
প্রতিপক্ষ সমান-সমান দণ্ড পায় যেন তবে।

সূত্রধার। সেই ঝড় সেই ঝটিকা এখনো দেখি
থামলো না ওর—

ক্রেয়োন। দেরি করে যদি সেপাইশান্ত্রী যতো
ওর চেয়ে কম শাস্তি পাবে না, এ-কথা ব'লে রাখি।

আন্তিগোনে। প্রতিটি শব্দ কানে বাজে প্রাণে বাজে
মৃত্যুর মতো।

ক্রেয়োন। জীবনের মতো জীবনের আশা ছাড়ো,
মিথ্যা প্রবোধ দিতে আমি পারবো না।

আন্তিগোনে। ওরে ও আমার পিতা ও পিতামহের
মহতী নগরী, শহরে আমার ঘর,
ঘরের দেবতা, চলেছি দ্বীপান্তর।
দেরি কেন আর, এখনি তো যেতে পারি,
সব চেয়ে শেষে এসেছি রাজকুমারী,
ব্রতের পুণ্যে আমি বন্দিনী নারী,
ব্রতপুণ্যের বর।

[প্রহরীরা আন্তিগোনেকে নিয়ে গেলো]

সংস্তব

স্থায়ী : এক

এমনই ভাগ্য ক'রে এসেছিলো দানাএ,
পিতলে রচিত কারার প্রাচীরে ঘেরা তার তনুখানি
রূপসী দানাএ মহীয়সী ছিলো জানি,
জিউসের দয়া স্বর্ণরেণুতে ঝরেছিলো সারা গায়ে,
সৌরশিশুকে দিয়েছিলো বুকে আনি';
বন্ধ কারায় সে তার নিয়তি নতশিরে নিলো মানি।

বিত্তের চেয়ে বিপুল নিয়তি, দুর্গপ্রাকার তার কাছে নিরুপায়,
অস্ত্রের চেয়ে কুটিল নিয়তি, তরীর চেয়েও দ্রুতবেগে চ'লে যায়।

অন্তরা : এক

এদোনিয়াদেশে ক্রয়াস-তনয় রাজা লুকাউর্গাস,
এমনই ভাগ্য তাঁর,
কোথায় মিলালো সেই সন্ত্রাস, তাঁর সে-অহংকার ?
তাঁকে বড়ো সাজা দিলেন দিয়নুসাস।
প্রস্তরতলে শুকালো রাজার গরবী ফুলবাহার,
কী সাহস, তিনি শাসিয়েছিলেন দেবদাসী মাইনাস
পূজারিণীদের, এভিয়ান শুভ অগ্নিকে পরিহাস
করেছেন, তাই হ'লো সে-রাজার দারুণ সর্বনাশ॥

স্থায়ী : দুই

কৃষ্ণশিলার গিরিবর্ত্মের নিখাদে ও ধৈবতে
এদিকে নিজের কূলের কিনারে মগ্ন বসফোরাস,
ঐদিকে একা সাল্‌মুদেসস জনহীন সৈকতে,
যেখানে আরেস ফেলেছিলো তার করুণ দীর্ঘশ্বাস,
কেননা আরেস চোখে দেখেছিলো, অকারণ দ্বৈরথে
বিমাতার হাতে নির্জিত সেই ফিনেউস-শিশু দুটি,
কেড়ে নিয়েছিলো বিমাতা তাদের আঁখির দিঠির দ্যুতি,
চিকন অঙ্গ ছুরিতে বিঁধিয়ে পেয়েছিলো উল্লাস,
শোণিতলুব্ধ কঠিন মুঠিতে রক্তক্ষয়ী পথে।

অন্তরা : দুই

জনম অবধি সেই দুটি শিশু কেঁদে-কেঁদে হ'লো সারা,
মা-র তরে তারা দুঃখে-দুঃখে কাটালো সকল বেলা,
বিস্ময়াহত প্রশ্নে নিয়ত ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে গেছে তারা
অকূল দুটি একেলা।

মা ছিলো তাদের এরেখথিয়স বংশ-উজল বাতি,
সে যে উত্তরে বায়ুর দুহিতা, পাহাড় চতুর্দিকে,
পিতার ঝঞ্ঝা বুকে আগলিয়ে জেগেছিলো অনিমিখে,
আকাশদুহিতা, তবু তারও 'পরে নামলো আঁধার রাতি,
যুগযুগান্তে জীবনে-জীবনে নিয়তির জাল ফেলা।

[অন্ধ ভাবি কথক তাইরেসিয়াসের প্রবেশ, তাঁর আগে-আগে পথপ্রদর্শক একটি বালক]

তাইরেসিয়াস

কুশল তো সুধীবৃন্দ ? আমরা সতীর্থ দুইজনে,
যাত্রার সম্বল শুধু আমাদের একজোড়া চোখ,
আমি অন্ধ, আমার নায়ক তবু আমার নির্ভর।

ক্রেয়োন। চরণে প্রণত, তাত, কী ভাগ্য দিলেন পদধূলি।

তাইরেসিয়াস। কথা আছে, ইচ্ছা তব কর্ণপাত করা বা না-করা।

ক্রেয়োন। আপনার আদেশের অসম্মান করিনি কখনো।

তাইরেসিয়াস। তাই রাজরথচক্র হয়নি শ্লথ বা বক্রগতি।

ক্রেয়োন। সে-ঋণ স্বীকার করি, অধমর্ণ সর্বদা আমরা।

তাইরেসিয়াস। সাবধান, তুমি এসে দাঁড়িয়েছো ক্ষুরধার পথে।

ক্রেয়োন। সে কী কথা ? কেঁপে উঠি আপনার কথার কশাঘাতে।

তাইরেসিয়াস। স্পষ্ট কথা বলতে চাই অন্ধকার উদ্‌ঘাটিত ক'রে।
শোনো, আমি দীর্ঘকাল ভবিষ্যদ্বক্তার আসনে
বসতে শিখেছি, আর দৈববাণী পড়তে শিখেছি।
এখনি বসেছিলাম সে-আসনে, হঠাৎ শ্রবণে
একাগ্র মনন ভেঙে গেরোবাজ কয়েকটা পাখির
কর্কশ আওয়াজ এলো, শিকারি পাখিরা নখে-নখে
ডানায়-ডানায় যুঝে চিৎকারে আকাশ ছেয়ে গেছে ;

অমঙ্গল আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম
সমস্ত সমিধ এনে প্রতিকার-যজ্ঞের আগুন
জ্বালাতে গেলাম, কিন্তু বৃথা সেই স্বস্তির কামনা—
তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ
ভরং নৃপায্যং।
পর্ষে তোকায় তনয়ায় জীবসে
স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥
সমিধ সমিধ হ'য়ে রইলো, তবু আগুন জ্বললো না,
স্তূপাকার মাংসমজ্জা জানুজঙ্ঘা থেকে কী-রকম
উৎকট দুর্গন্ধ রস গলতে লাগলো জলন্ত অঙ্গারে
আমার প্রাণান্ত শ্রম একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো।
যে-আমি সবার হ'য়ে দেখতে পাই, অন্ধ সেই আমি,
আর এ-বালক যেন অন্তর্যামী, ও আমার হ'য়ে
দেখতে পায়। এ-বালক আমাকে তখন ব'লে দিলো
সব কথা। তবে তুমি এই দুর্যোগের জন্য দায়ী ?
অভিশপ্ত ঈদিপাস ! সারমেয় আর শকুনিরা
তার সন্তানের মাংস খেয়ে গেছে, রক্তমুখে তারা
অপবিত্র ক'রে গেছে সব যজ্ঞবেদীর আহুতি।
তাই তো ঈশ্বর নিরুত্তর এত যজ্ঞসত্ত্বেও !
আর বলো কোন পাখি মরা মানুষের রক্ত দেখে
সেই রক্ত চেটে খেয়ে অমঙ্গলধ্বনি করবে না ?
এখনো সময় আছে, ভেবে ছাখো ; মানুষমাত্রেই
ভুল করে, ভুল করা স্বাভাবিক, ভুল সংশোধন,
সেও স্বাভাবিক। যদি ত্রুটি স্বীকারের পরে কেউ
সংশোধিত হয়, তাকে নির্বোধ বা দুর্জন বলিস।
বরঞ্চ, গোঁয়ার যারা, বুদ্ধিহীন আখ্যা পায় শেষে।

তাই বলি, মৃত মানুষেরে তুমি অবজ্ঞা কোরো না।
মৃত মানুষেরে তুমি আবার মেরো না, তাতে কোনো
পৌরুষ আছে কি? আমি তোমারই ভালোর জন্য বলি,
কাম্য কল্যাণ যদি চাও তবে অমান্য কোরো না—
অসতো মা সদ্‌গময়, আমি এক শুভার্থী তোমার।

ক্রেয়োন। বৃদ্ধ যে সন্দেহ নেই, তীরনিক্ষেপের কালে তবু
এদিক-ওদিক হয় না! আমি জানি, ভালো ক'রে জানি
পেশাদার জ্যোতিষীর সমস্ত রকম ছলাকলা,
যে-কোনো উপায়ে এই জ্যোতিষীরা স্বার্থসিদ্ধি ক'রে
জুয়া খেলে। কিন্তু সারা সার্দিনিয়ার রৌপ্যরাশি,
ভারতবর্ষের সব সোনা এনে উপুড় করুন,
বিশ্বাসহন্ত্রীকে তবু একতিল সমাধির মাটি
দেবো না, দেবো না আমি। ঈশ্বরের ঈগলের ঝাঁক
মৃতের কঙ্কাল ব'য়ে জিউসের শীর্ষসিংহাসনে
নিয়ে যাক, তবু জেনো বিশ্বাসঘাতক এক কণা
পাবে না সমাধি মাটি, তাছাড়া এ-কথা ব'লে রাখি
ঈশ্বরের মহিমায় হস্তক্ষেপ কোনো মানুষের
সাধ্যের আয়ত্তে নেই। কিন্তু তাইরেসিয়াস,
মুনফার লোভে মরে অতিশয় ধূর্ত সে-মানুষ
যে বলে কুচক্রী বাক্য তত্ত্বকথার আচ্ছাদনে।

তাইরেসিয়াস। হায়!
সারা পৃথিবীতে বুঝি একজনও জানে না, বোঝে না?

ক্রেয়োন। কী জানে না? বলুন না সর্বসমক্ষে সেই কথা।

তাইরেসিয়াস। জানো না কি সদুক্তি যে বিকোয় না স্বর্ণমূল্যেও।

ক্রেয়োন। এ-কথা অস্তুত বুঝি, নির্বুদ্ধিতা মস্ত ক্ষতিকর।

তাইরেসিয়াস। অথচ তোমার মধ্যে ক্ষতিকর সেই নির্বুদ্ধিতা।

ক্রেয়োন। রাষ্ট্রগুরু, অপমান করতে আমি ভ্রূক্ষেপ করিনে।

তাইরেসিয়াস। অপমানকারী, তুমি আমাকে বলেছো মিথ্যাচারী!

ক্রেয়োন। এই জ্যোতিষীর জাত যথারীতি অর্থপিশাচ।

তাইরেসিয়াস। রাজার লালসা তার চেয়ে আরো গর্হিত তাহ'লে।

ক্রেয়োন। আপনি কী বলছেন। আপনি কাকে কী বলছেন?

তাইরেসিয়াস। তোমাকে দিয়েছি রাজ্য, তুমি রক্ষী, আমি শিক্ষাগুরু।

ক্রেয়োন। ভূয়োদশ গুরুদেব, কিন্তু গুরুদক্ষিণাকাতর।

তাইরেসিয়াস। জিহ্বাসংবরণ করো, শেষ কথা এখনো বলিনি।

ক্রেয়োন। নিঃসংকোচে ব'লে যান, উৎকোচের ভরসা না-রেখে।

তাইরেসিয়াস। আমার ধর্মকে তুলি বাস্তবিক পেশা মনে করো?

ক্রেয়োন। করিই তো, নই কারো চক্রান্তচালিত ক্রীড়নক।

তাইরেসিয়াস। তবে বলতে বাধ্য হই। সূর্য তাঁর রথপর্যটনে
আরেক অয়নপথ অতিক্রান্ত হ'তে-না-হতেই
ঘনাবে তোমার রাত্রি। তোর পুত্র নিজ মৃত্যু দিয়ে
শুধবে মৃত্যুর ণ, মরণ তোমার মহাজন,
তুমি তার অধমর্ণ, তার কাছে দুই ভাবে ঋণী:
এক, তুমি একটি জীবন পাঠিয়েছো মরণের
পরীক্ষার্থিনী ক'রে জীবন্ত কবরে। দ্বিতীয়ত,
মৃত মানুষের মৃত্যুসূত্রে প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার
অস্বীকার ক'রে তুমি এক মানুষের মৃতদেহ
অনাদৃত স্বজনের রোদনবঞ্চিত অনাবৃত
রেখেছো পথের মধ্যে। এর ফল কখনো ভেবেছো?
কর্মফল ভোগ করো, প্রতিক্রুর নরকের প্রেত,
পাতালের পিশাচিনী তোর জন্য উদ্‌গ্রীব রয়েছে,
তারাই তোমাকে দেবে তোমার নিজস্ব পরিণাম।
বোঝো তবে কী ইষ্ট সাধিত হ'লো জ্যোতিষীর? বোঝো,

আর খুব বেশি দেরি নেই, তোর প্রাসাদমহল
আবালবনিতাবৃদ্ধ ভ'রে তুলবে মড়াকান্নারোলে ;
তোকে ঘিরে শাপ দেবে প্রতিবেশী প্রতিটি নগরী,
তাদেরও অর্পিতপ্রাণ শহীদেরা যোগ্য সম্মান
পায়নি, শিকারি জন্তু সংকার করেছে, তাদেরও তো
উনানে চুল্লিতে রক্ত পড়েছিলো পরিতৃপ্ত যতো
কুকুরের মুখ থেকে, শকুনির মুখ থেকে। তুমি
আমারে কথার বিষে দগ্ধেছো, এবার তুমি নিজে
বক্ষোবিদ্ধ হও অভিসম্পাতের ধারালো শায়কে,
মর্মে-মর্মে যাতনার অর্থ বোঝো, পরিতাপ করো।
ওরে বাছা, কই তুই, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল,
সাপ তার কণ্ঠবিষ উগরে দিক বয়োকনিষ্ঠেরে,
তারপর শান্ত হোক। চল বাছা, বাড়ি নিয়ে চল।

[তাইরেসিয়াস ও বালকটির নিষ্ক্রমণ]

সূত্রধার। উনি চ'লে গিয়েছেন, মহারাজ। ব'লে গিয়েছেন
দুর্বাক্য ভীষণ, আর রক্ষা নেই। এক মাথা চুল
যবে কালো ছিলো সেই যুবাকাল থেকে বৃদ্ধকালে
সব শাদা হ'লো—ওঁর কোনো বাক্য বিফল দেখিনি।

ক্রেয়োন। সে-কথা আমিও জানি, শঙ্কা এসে আমাকেও ঢাকে,
তাঁর কাছে নত হওয়া দুঃসহ যে, কিন্তু দর্পনাশা
নিয়তি দংশায় যদি, হায়, সে যে আরো দুর্বিষহ।

সূত্রধার। ক্রেয়োন, আপনি যদি পরামর্শ নিতেন এখন।

ক্রেয়োন। বলুন, বলুন, আজ শিরোধার্য আপনার আদেশ।

সূত্রধার। তবে মুক্ত ক'রে দিন সেই তরুণীরে, আর সেই
অবজ্ঞাত মৃতটির সমাধির উদ্যোগ করুন।

ক্রেয়োন। আপনারা তাহ'লে কি এ-ইচ্ছাই পোষণ করেন ?

সূত্রধার। মহারাজ, অতি শীঘ্র এই কাজ সম্পাদিত হোক,
অন্যায় প্রতিবিধানে দেবতারা সত্বর তৎপর।

ক্রেয়োন। হা ঈশ্বর ! এ বড়ো কঠিন কাজ, তবু তাই হোক,
বৃথা কেন আমি আর গ্রহের বিরুদ্ধে যুঝে মরি !

সূত্রধার। তবে যান, স্বহস্তে কঠিন কাজ সমাধা করুন।

ক্রেয়োন। এই মুহূর্তেই যাবো, যত অনুচর,
কুঠার কুড়াল নিয়ে সকলে এখনি
অদূর পাহাড়ে চলো, নির্দেশ পেয়েছি।
আগে তো বুঝিনি, বড়ো দেরিতে বুঝেছি
যে-আমি রুধেছি তারে, সেই আমি তার
বাঁধন খুলবো। যত কষ্ট হয় হোক,
আজীবন সনাতন সত্যরক্ষা ভালো।

সংস্তব

স্থায়ী : এক

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

শত নামে এক, তুমি কদ্‌মস্-কন্যার বাহুলীন,
বজ্রবন্ত জিউসের শিশু ইতালিয়া-প্রাণবায়ু।
রহস্যময়ী এলেউসিনিয়া তোমার চরণে ঝরে,
তোমার সকাশে ইসমেনাসের জল
ব'য়ে-ব'য়ে যায় র'য়ে-র'য়ে ছলোছল,
মোহনিয়া সেই মেয়েদের মাতা থেবা নগরীর 'পরে
মাটিতে লুকানো ড্র্যাগনের দাঁত—এ-সবই তোমার তরে ॥

অন্তরা : এক

তোমার জন্য দাবানল জ্বলে দুই চূড়া গিরিভঙ্গে
কোরুসিয়া যত নর্তকী নাচে উতল জলতরঙ্গে,

আরোহ ছন্দে রণিত তাদের চরণের কিঙ্কিণী,
নিম্নে বিনীতা কান্তালিয়ার স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী।
তোমার লাস্যে মুসা পাহাড়ের অঙ্গে
আঙুরগুচ্ছ বেয়ে-বেয়ে ওঠে সারাদিন সারাদিনই,
আঙুরগুচ্ছ দুলে-দুলে পড়ে অন্তরীণের অঙ্কে,
অপর্যাপ্ত পুষ্পস্তবক স্তোত্রসঞ্চারিণী,
এ-পথ ও-পথ অঞ্জলি দেয় তোমার মহাজীবনকে ॥

স্থায়ী : দুই

তীর্থের সেরা খেবাই নগরী তোমার প্রিয়,
তারে ভালোবাসো তুমি ও তোমার জননী জিউসজায়া,
তারি পাশে এসো, হেরো তার মুখে দুর্দিন ফেলে ছায়া,
তোরণে-তোরণে অভয়মন্ত্র দিয়ো,
চকিতে মেটাও ব্যথিতের ব্যথা তৃষিতের অশনায়া,
পার্নাসিয়ার পর্বতচূড়ে তুমি যে পার্নাসীয়,
গর্জমুখর জলপথ জুড়ে মূর্ত তোমার মায়া।

অন্তরা : দুই

অগ্নিবর্ষী তারাপুঞ্জের আলোড়িত সমতানে
তুমি অগ্রণী হে রাজরাজেশ্বর,
হে অধিনায়ক, সমবেত গানে-গানে
ঝরাও অঝোর নৈশিকী নির্ঝর—
বন্দে সবাই জিউসের সন্তানে ;
তুমি এসো, আর মাতুক তোমার মত্ত যতেক চর
সারারাত গীতিনৃত্যনাট্যে নায়কের সম্মানে।

[একজন বার্তাবহ প্রবেশ করলো]

তোমরা যারা বার্তাবহ কাদ্‌মস্ নগরীতে থাকো, তারা শোনো,
তোমরা যারা আক্ষিয়ন-নাগরিকবৃন্দ, তারা শোনো,

মানুষের জীবনের মজবুত ভিত্তি আছে কিনা,
বলতে পারবো না। তবে এটা ঠিক, ভাগ্য নামে এক
অদ্ভুত খেয়াল আছে, সে নাচায় সুখী ও দুঃখীরে,
কার কী কপাল কেউ কোনোদিন বলতে পারে না।
শত্রুর কবল থেকে ক্রেয়োন যখন এ-শহর
বাঁচিয়ে সারাটা রাজ্য সাবধান মুঠিতে নিলেন,
পিতার গৌরবে রাজসিংহাসন আলো হয়েছিলো।
তিনি আজ সর্বহারা—সেই তিনি। যে-জন নিজেকে
মন্দভাগা করে সে যে বেঁচে আছে ব'লেই ধরি না,
সে আসলে মারা গেছে : যদি ইচ্ছা করো ঘর ভ'রে
ধনরত্ন জমা করো, জমা করো, যতো ইচ্ছা করো,
রাজার পোশাক প'রে যতো ইচ্ছা রাজা সাজো তবু
যে-রাজ্যে আনন্দ নেই, ছায়া রাজ্য। সুখের বদলে
ছায়ারাজত্বের ছায়া কিনবো ব'লে ভুলেও ভেবো না।

সূত্রধার। এনেছো কী দুঃসংবাদ ? রাজার বাড়ির সর্বনাশ ?

বার্তাবহ। মৃত্যুসংবাদ, কিন্তু যে মেরেছে সে রয়েছে বেঁচে।

সূত্রধার। কে কাকে মেরেছে, বলো ; কোন সে-জল্লাদ ? কে মরেছে ?

বার্তাবহ। আইমোন মৃত, কিন্তু আগন্তুক মারেনি তো তাঁকে !

সূত্রধার। আততায়ী তাহ'লে কি তাঁর পিতা, না তিনি নিজেই ?

বার্তাবহ। পিতৃকর্মে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

সূত্রধার। ভাবিকথকের কথা ফ'লে গেলো অক্ষরে-অক্ষরে !

বার্তাবহ। যা-ই হোক, এর পর কী কর্তব্য, সেটাই ভাবুন।

সূত্রধার। কিন্তু এ কী, ঐ দেখি ক্রেয়োনের রানী ইউরুদিকে
এই দিকে আসছেন, দ্বারলগ্না দুর্ভাগিনী রানী—
অকারণে, নাকি তিনি আইমোনের কথা শুনেছেন ?

[ইউরুদিকের প্রবেশ]

ইউরুদিকে

ওগো নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের কথার গুঞ্জন
কানে আসছিলো, আমি পাল্লাস দেবীর পূজা নিয়ে
মন্দিরে চলেছিলাম, সেইক্ষণে। দরজার শিকল
যেই না খুলেছি অমনি অন্দরমহল থেকে এসে
চাপা শব্দ কানে বিঁধলো, আচমকা আতঙ্কে সংজ্ঞাহারা
মাথা ঘুরে একেবারে প'ড়ে গেছি দাসীদের হাতে :
কিন্তু কী বলছিলেন, সমস্ত বলুন। বহুদিন
আমি দুঃখসহা, আমি সব দুঃখ সইতে পারবো।
বার্তাবহ। মহারানী, সে-ভার নিলাম আমি, যা দেখেছি সবই
নিবেদন করি, আমি এক বর্ণ কমাবো না তার।
একটু গল্পের রং চড়াবো না, সেই রূপকথা
মিথ্যা কথা হবে। তাই সত্য কথা সবচেয়ে ভালো।
মহারাজ যাচ্ছিলেন পাহাড়ের চূড়োয়, যেখানে
মড়া পোলুনাইকেস প'ড়ে ছিলো, কুকুরের দল
ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে তাকে। প্লুতো, পাতালের যম আর
ত্রিপথেশ্বরী হার্, এই দুই দেবতার কাছে
পোলুনাইকেসের নামে প্রার্থনা করতে বসলাম :
তারপর মৃতদেহ জলে ধুয়ে পাশের বনের
গাছ থেকে ডাল কেটে ছড়ানো মাংসের টুকরোগুলি
জড়ো ক'রে চিতা সাজালাম, শেষে ছাইয়ের উপরে
মাতৃভূমি থেবানগরীর মাটি ছড়িয়ে দিলাম।
তারপর, একটু না-জিরিয়েই খুঁজতে গেলাম
রাজকুমারীর জন্য পাথুরে গালিচা-পাতা ঘর—
যেখানে মরণ তার ঘরনীর জন্য অপেক্ষায়

ওৎ পেতে ছিলো, সেই গুহাগর্তে। আমাদের মধ্যে
একজন শুনতে পেলো কে যেন ককিয়ে উঠলো জোরে,
সে তখনই ক্রেয়োনকে ডেকে আনলো, বাতাসে কে যেন
কেঁদে যাচ্ছে পাষাণব্যথার ভারে, সেই স্বর ধ'রে
সামনে গিয়ে আমাদের মহারাজা ডুকরে উঠলেন—
"হা অদৃষ্ট! বুক কাঁপছে সর্বনাশের আশঙ্কায়।
এমন ভীষণ রাস্তা এ-জীবনে কখনো হাঁটিনি।
এ নিশ্চয়ই রাজপুত্র আইমোনের কান্নার স্বর!
ওরে ও প্রহরী, চল ;—পাথর সরিয়ে গুহামুখে,
দেখি সত্যি আইমোনের গলার আওয়াজ কিনা, নাকি
স্বর্গ থেকে দেবতারা মোরে করে ব্যঙ্গকৌতুক।"
—সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেছি আমরা সবাই, তারপর
শেষ গুহাগর্তে যেই পৌঁছলাম, থমকে গেলাম,
পরনে তসরশাড়ি গলায় দড়ির ফাঁস হ'য়ে
মেয়েটিকে ঘিরে আছে, ঝুঁকে সে-মেয়েটি ঝুলে আছে,
আর তার কাঁধে তাকে জড়িয়ে কাঁদছেন আইমোন,
চিরতরে শেষ মিলনের ছিন্ন গাঁঠছড়া ধ'রে
অবলা বধূর কাছে পিতৃভয়ে ভাগ্যহত স্বামী।
রাজা সব দেখলেন, আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন :
"এ তুই কী করেছিস, আইমোন? তোর মনে কী ছিলো?
ঘটেছে কী দুর্ঘটনা? আয়, আয়, বাইরে চ'লে আয়,
আমি তোর পিতা, তোর কাছে তোরই প্রাণভিক্ষা করি।"
শুনেও রাজার ছেলে তীব্র ঘৃণাভরে তাঁর দিকে
তাকালেন, রাজার মুখের 'পরে থুতু ফেললেন,
নিঃশব্দে ছোরার বাঁটের ভাঁজে হাত রাখতেই
রাজা পিছু হটলেন, ছোরাটার টিপ ফসকে গেলো,

রাগে ক্ষোভে রাজপুত্র অমনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন
ছোরাটার মুখে, বুক ফেটে রক্ত ঝলকে-ঝলকে
ছুটে এলো, তিনি তবু শ্বাস টেনে কাঁপতে-কাঁপতে
বধূকে বুকের মধ্যে ক্ষতস্থানে জড়িয়ে ধরলেন
অবশ দু'হাতে, রক্ত অঝোরে ফ্যাকাশে গাল বেয়ে
পড়তে লাগলো···তাঁর মৃত্যু ঠিক এই ভাবে হ'লো।
মৃত্যু ও মিলন হ'লো একাকার, একটি দম্পতি
উৎসব করার জন্য রাত্রির বাসরে গেলো চ'লে···
যে এ সব ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক, সে-ই বোঝে
মানুষের দুঃখের কারণ তার অদূরদর্শিতা।

[ইউরুদিকের নিষ্ক্রমণ]

সূত্রধার। এ কী! মহারানী দেখি কোনো কথা না-ব'লে হঠাৎ
চ'লে গিয়েছেন, কেউ বলতে পারো কেন গিয়েছেন?

বার্তাবহ। আমারও অবাক ঠেকছে, তবে, মনে হয়, মহারানী
শোকে মোহ্যমান তবু লোকচক্ষে তাঁর সে-দুঃখ
দেখাতে চান না, তাই চুপি-চুপি কাঁদতে গেছেন।
তাঁর সঙ্গে ঘরের দাসীরা শুধু আড়ালে কাঁদবে,
ভেঙে পড়লেও তিনি রাজরানী, শান্ত, গরবিনী।

সূত্রধার। কী জানি, নিজে তো আমি চরম দুটোই ভয় করি,
মৌন নিথরতা কিংবা বুক-ফাটা কান্নার মূঢ়তা।

বার্তাবহ। যা হোক, এখন সব জানা যাবে। বাড়ির ভিতরে
দেখে আসি কী ক'রে যে মহারানী এত বড়ো শোক
মুখ বুজে সইছেন। মহাশয়, ঠিক বলেছেন,
বোবা নিথরতা পাথরের মতো বুক চেপে বসে।

[প্রস্থান]

সংস্তব

হেরো, হেরো ঐ রাজাও বিফলকাম,
দু'হাতে বহেন নিজের দুঃখভার,
হেরো চঞ্চল মানুষের পরিণাম,
স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষয় করে সংসার।

[রক্ষীসহ ক্রেয়োনের প্রবেশ, আইমোনের
মৃতদেহ ক্রেয়োন বহন করছেন।]

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : এক

অন্ধ চিত্তে বুনেছিলাম পাপের পরে পাপ,
এখন পরিতাপ,
শক্তিমান—সে বুঝি বাঁধে? সর্বশক্তিমান—
সে বুঝি হানে? তোমরা ছাখো বিচিত্র বিধান।
তোমরা ছাখো—ঘাতক পিতা, নিহত সন্তান!
মৃত্যু নিলো যৌবনের প্রাণ,
এ যেন যুবা নবজাতক সম,
নিশ্বাসের পবন হ'লো নিশ্চুপ পাষাণ,
আমারি পাপ, নিরপরাধ বিগত শিশু মম।

সূত্রধার। বিলম্বিত, মহারাজ, সত্যপথে এসেছেন আজ।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : দুই

এখন শুধু রুক্ষ পথ, পারিনে যেতে আর,
বিনত শিরে বহন করি অভিশাপের ভার,
ক্লান্তি নামে ক্লান্তি ছায় দিনান্তে আমার,
দেবতা রাখে আমারে তার পক্ষম পদতলে,

অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার,
মিথ্যা হ'লো সকল শ্রম, দিন গেলো বিফলে।

[বার্তাবহের প্রবেশ]

বার্তাবহ। প্রভু, বুকভরা দুঃখে আজ আপনি ব্যথার মালিক,
একটি ব্যথার ভার আপনার দু'হাতে এখন,
আরেকটি আপনার অট্টালিকায়, অপেক্ষায়।

ক্রেয়োন। কোন দুর্ঘটনা? আর কোন সর্বনাশ বাকি আছে?

বার্তাবহ। আমাদের মহারানী, রাজপুত্র আইমোন-মাতা
স্বর্গতা এখন, তিনি সদ্যোমৃতা, দুঃখের আঘাতে।

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা : এক

তোমার সাথে কে পারে হাইদাস্,
কালান্তক তুমি যে যম পাতালদ্যাম্পতি,
অসন্তোষে কাড়বে কেন আমার নিশ্বাস?
কীর্তিনাশা, এনেছো তুমি এ-কোন দুর্গতি!
মৃত যে-জন, আবার তার প্রতি
নিদয় কেন হানো মরণ-পাশ?
করুণাহীন, এখনো সংহরো,
মরণে কেন আরো মরণ সংকলন করো,
নিয়েছো কেন নারীর প্রাণ, দুঃখে কেন বাড়াও সন্ত্রাস?

বার্তাবহ। দেখুন নিজের চোখে। খুললো প্রাসাদসিংহদ্বার।

[উন্মুক্ত বেদী দেখা যাচ্ছে, ইউরুদিকের মৃতদেহ বেদীতে শায়িত]

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা : দুই

বলো কী কাজ এখনো বাকি আর?
কোন কাহিনী এখনো অকথিত?

বাহুতে মোর কুমার সুকুমার
মৃত!
চোখের পরে পুঞ্জীভূত
মরণ জমে। কুমার গেলো! জননী গেলো তার!

বার্তাবহ। ওখানে বেদীর মধ্যে তীক্ষ্ণ ছুরিতে বক্ষ বিঁধে
রাজকুমারের মাতা, রাজরানী। চোখের পাতায়
পূর্বমৃত মেগরিয়াসের জন্য কালো চোখে কেঁদে
তারপর আইমোনের নাম নিয়ে কান্না তাঁর!
সবশেষে পুত্রঘাতী রাজার উদ্দেশে অভিশাপ।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : তিন

শঙ্কায় আমি স্তব্ধ অসাড়!
সুতীক্ষ্ণ ছোরা হাতে আছে কার?
কাছে এসে নাও জীবন আমার।
হায়, হায়, আমি কেন বেঁচে আর?
যন্ত্রণা সার, যন্ত্রণা সার।

বার্তাবহ। হয়তো এটাই তিনি চেয়েছেন মৃত্যুর সময়:
"যার জন্যে আমার দু-ছেলে গেছে, প্রতিফল পাক্।"

সূত্রধার। কী ভাবে বরণ ক'রে মৃত্যুকে নিলেন মহারানী?

বার্তাবহ। যেই শুনলেন তাঁর পুত্রের মরণে কান্নারোল,
অমনি বুকের মাঝে ছোরাটাকে বসিয়ে দিলেন।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : চার

আমার এ-পাপ, আমার এ-শোক,
আরোপ কোরো না নিরপরাধে,
আমিই আমার পুত্রঘাতক,

এই ধরণীর শেষ সীমাতে
নিয়ে যাও মোরে। আমি পলাতক
জন্মদিনেই মৃত্যুফাঁদে!

সূত্রধার। আপনি ভালোই বলেছেন, ঘোর দুঃসময় এলে
যা হবার সেটাই তো অতি দ্রুত হ'য়ে যাওয়া ভালো।

ক্রেয়োনের গান
অন্তরা : তিন

নিয়তি, তোমায় স্বাগত অপার,
মোর শিরে হানো চিরবিরতি,
আনো অন্তিম রাত্রি আমার,
সেই তো আমার পরমাগতি,
দেখতে দিয়ো না প্রত্যূষা আর।

সূত্রধার। কালকের কথা কাল ; আজো কিছু করণীয় কিনা,
ভাবতে হবে। এর বেশি আমাদের চিন্তনীয় নয়।

ক্রেয়োন। মিশেছে আমার কণ্ঠ সবার মিলিত প্রার্থনায়।

সূত্রধার। প্রার্থনা এখন থাক। অনিবার্য অদৃষ্টের থেকে
পৃথিবীর মানুষের একতিল অব্যাহতি নেই।

ক্রেয়োনের গান
অন্তরা : চার

মানবজন্ম গেলো পরমাদে,
এমন জীবন অবসান হোক,
পত্নীহন্তা পুত্রঘাতক—
কে তারে ক্ষমিবে? নিজেরি হাতে
নিজে মরি আমি। অসহ অমোঘ
তমিস্রভার নিয়েছি মাথে।

[রক্ষীসহ ক্রেয়োনের নিষ্ক্রমণ]

সংস্তব

মানুষের কাছে প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর
আর-কিছু নেই। বিধাতার বাণী সগৌরবে
নিত্য ধ্বনিছে, সেইখানে মাথা নোয়াতে হবে।
মুখর দম্ভ প্রভুর অনল এড়ালো কবে?
মহানির্বাণে দর্প হরো,
তার আগে তুমি বৃদ্ধেরে করো জ্ঞানবৃদ্ধ, গোধূলিনভে॥

ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমি আমার ভালোবাসা পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে,
হে সম্রাজ্ঞী, যেমন অশথডাল
অশথডালকে ভালোবেসে অনায়াসে দাবি জানায়—
কিন্তু তোমার সাপেক্ষ দেশকাল।

তবে আমার ভালোবাসা দেশকালাতীত ধ্যানধারণা ?
করিনে সেই পল্লবিস্তার ;
খুব বেশি দূর যাইনি আমি, আমার শুধু সীমান্ত এই
এদিক-ওদিক বাংলা ও বিহার—

ছুটি হ'লে দেওঘরে যাই, তখন আমার সঙ্গে থাকেন
পথের বন্ধু চারজন পাঁচজন,
এই দেওঘর আগে ছিলো বাংলাদেশের, আজ বিহারের ;
(ছুরি চালান লর্ড কার্জন ?)

বাংলাদেশের মধ্য থেকেই তোমার চিঠি এসেছে আজ,
ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ,
কিন্তু তুমি চোরা চাবুক মেরেছো ঐ চিঠির মধ্যে,
বিদেশিনীর আঙ্গিকে চাবুক।

চৌকাঠে তাই থমকে আছি, মায়ের দেয়া মোটা কাপড়
ঢেকেছে আজ আমার কঙ্কাল,
ঘরোয়া এই ঘরের ভিতর আমার পাশে স্পষ্টভাষী
ডাকটিকিটের বিপিনচন্দ্র পাল ॥

দুটি অপ্রাকৃত কবিতা

তারাপদ রায়

সাইকেল, গাধা এবং ধোপার কাহিনী

'একটা সাইকেল পেলে যাওয়া যেতো
ধোপাদের উজ্জ্বল দোকানে।...'
ধোপার বাতিল, মৃত গাধা
অন্তরীক্ষে হেসেছিলো এইটুকু শুনে।
সে ছিলো অনেক কাল
মনিবের নিত্যসঙ্গী ভাঁটিতে, দোকানে।
সে জানে, ভালোই জানে
উজ্জ্বলতা, কী যে তার মানে,
বিশেষত ধোপার দোকানে ॥

গোরস্থান

'মোল্লার ইজ্জৎ নেই, গোলাম-বাদ্‌শারও...'
এই নিয়ে হাসাহাসি ক'রে
খেঁকশেয়ালের তিন তরুণ শাবক
অন্ধকারে গোরস্থানে নিস্তব্ধতা ফেলে চ'লে গেলো।

মাঝরাতে আশশ্যাওড়ার ঝোপ থেকে
উঠে এলো হলুদ করুণ চাঁদ বাদামি আকাশে
সঙ্গে এক শীর্ণ চামচিকে।

কবরে মাটির নিচে পাশ ফিরে শুতে কষ্ট হ'লো ;
ফজল গুণ্ডার আত্মা জানলো না
তার কালরজনীর বিবি
আজো চোখে সুরমা এঁকেছে ॥

তিনটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কোনো দার্শনিক কবিকে

তুমিও জেনেছো শীত ভোরবেলা হিমেল হাওয়ায়,
বিলোল তৃষ্ণার ছলে নামঞ্জুর ঠোঁটের কাকলি,
তবে কেন স্তোক দাও, দর্শন উজাড় করো অমূক সভায়—
যেন হতবাক ছিলে, এইমাত্র জেনেছো সকলই।

ভাবি, কেন চোখ দিলে ; ঐ ভাবে শিস দিয়ে গেলে
গ্রামের ভাঁড়ের দলে এতদিন রঙিন মেলায়
পাখির পালক চুলে হরবোলা হতেম বিকেলে—
কেন স্লেট হাতে নিয়ে ডাক দিলে আরেক খেলায় ?

জানো, স্নায়ু তীব্র কত। একভাবে তপ্তজল ঢালে
মুদি, কি পরম জ্ঞানী, (বাজারের ক্লান্ত লেনদেনও),
ভুলেছো, কেমন রোদ কমবেশি মেখেছি সকালে—
যদি সব মনে থাকে, তবে আর পংক্তি লেখা কেন ॥

সম্পর্ক

সবাই গুছিয়ে নেয় : মেধাবী, কি নিতান্ত অবোধ,
অনন্তের ধ্যান চোখে তুলে নেয় মুহূর্তের মেকি—
কিন্তু, যে-লোকটা তার কোনোদিন বোঝেনি আমোদ,
অজস্রের হাহাকারে তার কোনো স্বপ্ন ছিঁড়েছে কি ?

* * *

ছিলো কি রাজার হালে ? ঘর, ফুল, পাথর, অথবা
আস্ত মানুষ যার ভাঁড়ারের কৌটো ভ'রে থাকে—
কিন্তু বাহবা দিলে আসরের অন্ধকারে বোবা
সে খোঁজে নিজের দুর্গ, চোখ ভাবে গাছের পাতাকে।

কোথাও পৌঁছবে কিনা, সে এখনও নিজেই জানে না—
শব্দ ছাড়া কিছু নেই, শব্দে তার স্বোপার্জিত ক্ষমা,
জয়, পরাজয়, গ্লানি, বাচালের উচ্ছ্বসিত ফেনা,…
সমস্ত ফুটিয়ে নেয়, অল্প আঁচে, একটি উপমা ॥

অপেক্ষা

একটা কথা আমায় জানতে হবে
ওরা আমায় পাহাড় থেকে
গড়িয়ে ঠেলে দিলো কেন ?
ঠেলে যদি দিলোই, তবে হাওয়াও কেন অমন মৃদু ভ্রমর,
ঘুরে-ঘুরে, মা গো, আমায় ঘিরে-ঘিরে সুরের মতো ওড়ে।

নইলে, ঐ পূর্বপুরুষ সাতটি তারার চোখে ঢ'লে
ঘুমের ছলে আমায় ডেকেছিলেন ; তবু, সেদিন
যাইনি, আমায় জেনে নিতে হবেই ব'লে—
কেন ওরা পাহাড় থেকে, পাহাড়তলির বাড়ি থেকে
আমায় অমন অতর্কিতে ঠেলে দিলো।

একটা কথা আমায় জানতে হবে।
দু-তিনটে লোক অমন ক'রে তাকায় কেন ভিড়ে,
কেমন ক'রে জানে আমার রক্তে কোনো আগুন আছে কিনা—

পরখ ক'রে দেখতে যদি ভালো লাগে,
ওরা আমার পাঁজর ছেড়ে, আমার পথের ধুলো ছুঁয়ে
অট্টহাসি ক'রে উঠলো কেন—
একটা কথা আমায় জানতে হবে।

বুকে অনেক দুঃখ কিন্তু আমার কথা কাউকে বলিনি—
ধূর্ত চোখে ছোরা জ্বলবে ভেবে এখন রাত্রে ব'সে আছি,
ম'রে যেতে-যেতেও দেখবো, কোনো নদীর জলে এসে
ওদের ছায়া লজ্জা হ'য়ে কাঁপে কিনা—
লুটোয় কিনা কোনো নদীর বিশাল নীল ছায়া।

একটা কথা আমায় জানতে হবে।
কেমন ক'রে জানে ওরা, এখানে শেষ ওখানে তার শুরু,
কোনো ঘরের দেয়াল বেয়ে লতা উঠছে কিনা—

একটা কথা আমায় জানতে হবে।

দুটি সনেট

স্তেফান মালার্মে

তোমার গল্পে প্রবেশাধিকার পাওয়া···

(M'introduire dans ton histoire...)

তোমার গল্পে প্রবেশাধিকার পাওয়া
—যেন সচকিত বীরের সতর্কতা
নগ্নচরণ হ'য়ে, তার অন্যথা
কিঞ্চিৎ সেই জমি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া

যেখানে অনেক হিমবাহ-ভাঙা হাওয়া—
জানি না সে-পাপ, তাতে কৌশলপ্রথা
থাকুক, করে না তোমার অনন্যতা
আমাকে রুদ্ধ। আমি হেসে জিতে যাওয়া।

বলো, যদি আমি না হই আনন্দিত,
পদ্মরাগ ও বজ্রে আবর্তিত
এ-অগ্নিমুখ হাওয়াকে কী ক'রে রত

দেখি অরাজক ছড়ানো রাজ্যে, যাতে
সে-মৃত্যুমুখ রাজকীয়তার মতো
আমার সন্ধ্যারথের চাকায় মাতে।

সে এক অলকগুচ্ছ
(La Chevelure...)

সে এক অলকগুচ্ছ, অগ্নিশিখ উচ্চ বাসনার
সুদূর প্রতীচী যেন মুক্ত করে সর্ব আবরণ
প্রচিত (বলি, সে যেন মৃত্যু এক রাজক্ষমতার)
জয়মৌলি ভ্রূ'তে তার উত্তাপের মাটি সনাতন।

অস্বর্ণাভ তবু, তাই দীর্ঘশ্বাস ! এ-জীবন্ত মেঘ
অচিন্ময় সম্ভাবনা সর্বদাই রাখে অন্তরীন
মূলত যেখানে শুধু এক পাবে প্রবাহ-আবেগ
রত্নময় চোখে, হোক উৎসাহী বা ছলনারঙিন।

স্পর্শভীরু নায়কের উলঙ্গতা প্রকাশিত ক'রে
তাকে যা না গতিময় তারা কিংবা অর্চি তর্জনীর
আনে না তবুও শুধু সরলার্থে সে-মেয়ের পরে
সগৌরব শিরোশোভা, অচিন্ময়, প্রবঞ্চিতাটির

চুনিতে রোপণ হলে যতো প্রতিপালিত সন্দেহ
যেন এক আনন্দিত রক্ষয়িতা আলোকের দেহ।

অনুবাদ : প্রণব চট্টোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

তরুণ সান্যাল

প্রতিহারীর বিলাপ

দীর্ঘ দেবদারু গাছ জঙ্ঘায় তোমার,
স্তনযুগে ক্ষিপ্র ফণিমনসার কাঁটা,
পাটভাঙা নীল শাড়ি ছিঁড়ে নেয় ত্বক, সমারোহে
একে অন্যে জলাঞ্জলি দেয়, চায় মূল্য উপমার—
আমি আছি দৃশ্যের প্রলয়ে।

দূরে-দূরে ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জ, ওরা কামনার মধ্যরাত্রি হাতে
সমুদ্রের ভূকম্পনে দ্বীপ—
লক্ষ প্রদীপের শিখা দাবানল-জ্বালানো আঙুলে
স্বর্গের দুয়ার তুমি, আমি প্রতিহারী
ঐ কুঞ্জে কীট আছে, সেও আমি, যৌবনের ফুলে
ঘিরে আছে দশ পাপড়ি আমার নখের তরবারি।

এখন রক্তের গাঢ় অন্ধকারে ঘুম ফেরে জোনাকি আলোর
উত্তীর্ণ তীর্থের দিকে প্রসারিত ব্যাপ্ত করতল—
(আমায় ফেলো না এই শূন্য প্রান্তরের পথে যেতে
'হাওয়া হবে পিপাসায় জল')।

আমি অন্তরালে আছি গুপ্ত ঘাতকের মনে, দ্বারী
কে যায় মহলে, যাও, পাতা, ফুলে ফলে গন্ধে নারী ॥

অশ্রু

কোথাও তো জল নেই, কিন্তু জলধারা
এই ছাখো করতলে, এই ছাখো জল,
আমার জন্মের আগে কতবার সূর্য উঠেছিলো
কতবার মেঘ হ'লো স্রোত, হ'লো আকাশগঙ্গার চলাচল,
আমার সে-দুটি আয়না দুটি করতল।

প্রিয় গান, প্রিয়তম সুর, এক নারী, একটি বেহালা,
শেষরাতে চাঁদ-ওঠা স্তব্ধতার সুরা
আমার চোখের ঘন বিশৃঙ্খল অরণ্য, মরণ
প্রান্তরের শিশিরে বিছানো—
আমি পেতে চাই ব'লে, কণ্ঠে দোলে কলঙ্কের মালা।

সপ্তর্ষি দেখি না, ঐ কালপুরুষের খড়্গ, আমি
রোদের বর্ণালি আর মৃত তারাদের কমণ্ডলু
ধারণ করেছি চোখে, বুকে যথাক্রমে—
যেতে চাই কালের সংগমে,
যেখানে নির্বাক শিলা ভূত, বর্তমান ও আগামী—

কোথাও তো জল নেই, করতল,
আমার দর্পণ করতল॥

উনগারেত্তির কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

উনিশ শতকের শেষ থেকেই য়ুরোপের কবিতায় পালা-বদল শুরু হ'লো। তথ্যবিস্তার, লোকরঞ্জন, রাজনীতি—ইত্যাকার পুণ্যার্জন ছাড়াও কবিতার যে অন্য লক্ষ্য থাকতে পারে, এবং সে-লক্ষ্য যে কম কাম্য নয়, এ-বিষয়ে একমত হলেন অনেকে। বস্তুত, এই পালা-বদলের মূলে ছিলো বিশুদ্ধতার প্রেরণা : কবিতাকে বিশুদ্ধ হ'তে হবে, যা বর্জনীয় তা নির্দ্বিধায় পরিত্যাজ্য, গড়নে খাটো হোক, আকারে-প্রকারে গতকালের মেদলালিত্য না-থাকুক—তাকে নির্ভার হ'তে হবে, নির্বহুল, প্রয়োজনবোধে নিরলংকার। এডগার পো দীর্ঘ কবিতার জাত মেরেছিলেন ; শুধু তা-ই নয়, তিনি বুঝেছিলেন যে-কোনো শিল্পকর্মের পক্ষে রহস্যারোপ এবং প্রতীকধর্মের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। অর্থাৎ সেই সব লক্ষণ, যার ফলে কবিতার দৈর্ঘ্য বাড়ে না, ঘনত্ব বাড়ে, এবং ইঙ্গিতের খোরাকে আমাদের কল্পনাশক্তি লাভবান হয়। পো প্রথম শ্রেণীর কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিও যদি না-হন, তাতে কিছু এসে যায় না, সাগর-পারের একটা দেশ যখন তাঁকে সামনে রেখে কবিতায় প্রায় যুগান্তর নিয়ে এলো, তখন তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। যাকে দীর্ঘ কবিতা বলে, ফ্রান্সের প্রতীকী কবিরা সেখান থেকে গা বাঁচিয়ে চলতেন, কিন্তু ছোটো কবিতাই যে লিখতে হবে, এ-রকম কোনো জেদ ছিলো না তাঁদের। কার্যত, মোটামুটি দীর্ঘ কবিতা তাঁরা অনেকেই রচনা ক'রে গেছেন। কিন্তু ফিতে-মাপা কবিতার আকারটাই এখানে সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, আমাদের জানবার কথা হ'লো যে—কী ভাবে রোমান্টিক আতিশয্য এবং উচ্ছ্বাসকে পরিত্যাগ করতে শিখলেন কবিরা, শিখলেন যে শব্দশুদ্ধি এবং উপমাসৃষ্টিই কবির প্রাথমিক কর্তব্য, নিসর্গ শুধু বর্ণনার বিষয়বস্তু নয়—বরং উপমার উৎস, প্রতীকের জননী। ফলত, কবিতার শরীর আর নড়বড়ে থাকলো না; একটু বা রোগা হ'লো, একটু সংহত, কিন্তু শৈথিল্যরহিত, এবং যথাসাধ্য বিশুদ্ধ। আবার পার্নেসিয়ানদের

পদ্যের মতো আকারসর্বস্ব নয়, মালার্মে কবিতাকে শক্ত ফ্রেমের মধ্যে এঁটেও ছড়িয়ে দিলেন, ভের্লেনে শব্দ আর প্রতীক গুঞ্জিত হ'য়ে উঠলো।

বিশ শতকের ইতালীয় কবিতায় ফরাসী কবিতার, বিশেষত ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিতার প্রভাব লক্ষ্য ক'রে ঐতিহ্যধারক কোনো-কোনো ইতালীয় সমালোচক যে-আক্ষেপ করেছেন, তাতে আমরা সায় দিতে পারি না। কেননা, ফরাসী কবিতা থেকে ইতালির কবিরা সেই গুণগুলিই বেছে নিয়েছেন, যা আমরা এইমাত্র আলোচনা করেছি, এবং খুব সংক্ষেপে, যাকে বলা যায়: বিশুদ্ধ কবিতার প্রতি আগ্রহ। বলা বাহুল্য, অন্য যে-কোনো দেশের মতো ইতালিতে এই আধুনিক কবিরা অবহেলিত এবং তাঁদের যে 'আলোছায়ার কবি' বলা হয়, তার কারণ প্রধানত এই যে তাঁদের কাব্যচর্চায় পূর্বসূরীর প্রাচুর্য বা প্রভূত ঔজ্জ্বল্য নেই, কাব্যদুচ্চির শ্রান্তিহারক আশাবাদ নেই, এমনকি দান্নুনৎসিয়োর আলংকারিক উচ্ছ্বাস পর্যন্ত বহুলাংশে অনুপস্থিত। অন্যদিকে, আমি যাঁদের কথা এই মুহূর্তে মনে রাখছি—সেই উনগারেত্তি, মনতালে, বা কাসিমোদোর সঙ্গে আধুনিক ইতালির চাঞ্চল্যকর কবি ফিলিপ্পো মারিনেত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। কিংবা, তাঁর সেই ফিউচারিস্ট ইস্তাহারের সঙ্গে, যার মূলমন্ত্র ছিলো যন্ত্র, যুদ্ধ, আর গতির জয়গান, এবং যার প্রথম লাইন শুরু হয়েছিলো এইভাবে, "স্পর্ধা, দুঃসাহস, আর বিদ্রোহ—এই হচ্ছে কবিতার সারাৎসার"। কিন্তু উনিশ শো বারো সালে, ফিউচারিস্ট ইস্তাহার বেরোনোর তিন বছর পরে, সম্পূর্ণ অন্য রকম একটি ইস্তাহারে একে-একে স্বাক্ষর পড়লো কয়েকটি কবির। উনগারেত্তির এই ইস্তাহারে জোর দেয়া হ'লো শব্দের ওপর, শব্দের মুক্তির ওপর; স্থির হ'লো, পংক্তিবিন্যাসে ব্যাকরণের নিয়মই যে মানতে হবে, তার কোনো মানে নেই। শব্দচেতনা, উপমার প্রতি যত্ন, পংক্তিবিন্যাসে স্বাধীনতা—এ-সমস্তই উনগারেত্তির কবিতায় প্রাপ্য, এবং সমস্ত কিছুই প্রকারান্তরে ফরাসী প্রতীকী কবিতার প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু বাইরের দিক থেকে একাধিক উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও, ফরাসী সিম্বলিস্টদের বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা থেকে উনগারেত্তির নিজস্ব ধারণাটি স্বতন্ত্র। জীবনের সঙ্গে

শিল্পের পার্থক্য, জীবনকে প্রকৃতিকে শিল্পের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ, কৃত্রিমের বন্দনা, জীবনচর্চার স্পর্শে শিল্পের সম্মানহানির আশঙ্কা—সব কিছুই, কোনো-না-কোনো ভাবে, ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিতায় উপস্থিত। মালার্মের এরদিয়া এবং তাঁর ধাত্রী যথাক্রমে শিল্প এবং জীবনের প্রতীক—ঘুরে-ঘুরে, একটু অন্য ভাবে, এই বিপরীতের প্রতীক তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। জীবিতার স্তন উপেক্ষা ক'রে মালার্মে আমাজনীয় স্তনের বন্দনা করেছেন শুধু এই কারণে যে দ্বিতীয়টি মৃত, অ-প্রাকৃতিক, বিশুদ্ধ, এবং শিল্পের কাছাকাছি।

কিন্তু উনগারেত্তির 'একটি মানুষের জীবন',* যেখানে তাঁর চারটি বইয়ের কবিতা সংকলিত হয়েছে, তার ভিত্তিভূমি স্বতন্ত্র। জীবন এবং শিল্প, প্রকৃতি এবং শিল্প সম্বন্ধে ফরাসী প্রতীকী কবিরা যে-ধারণা পোষণ করতেন, উনগারেত্তি তা করেন না। এ-বিষয়ে আদৌ কোনো ধারণা তিনি সচেতনভাবে পোষণ কিনা, সে-সম্পর্কেও কোনো কৌতূহল জাগে না আমাদের। তিনি বিশুদ্ধতার চর্চা করেন সোজাসুজি ব'লে দেবার কৌশলে। অনুবাদের সাহায্যে প'ড়েও মনে হয়—প্রত্যক্ষতাই তাঁর বিশুদ্ধতা। দু'একটি মুহূর্ত, একটি মৃত, আর তার চারপাশের ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘটনার মধ্যে বহুদূর থেকে একটি দীর্ঘ আলো এসে পড়লো—উনগারেত্তির কবিতা প'ড়ে এ-রকম অনুভূতি হয়।

প্রথম বইটি থেকে সংকলিত কবিতাগুলিতে 'আমি' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বই থেকে 'আমি'-র সংখ্যা কমতে শুরু করেছে—কিন্তু কখনোই বিলুপ্ত হয়নি। তিনি যে মূলত লিরিক কবি, একটি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ পরিবেশে একটি বিশেষ 'আমি'—এই ছবিটি কখনো-কখনো একটি পুরো কবিতা হয়েছে (যেমন, 'সন্ধ্যা', 'সকাল'), কখনো-কখনো একটি কবিতার অংশ হয়েছে (যেমন, 'আমি একজন প্রাণী', 'নদীরা')। 'তীর্থযাত্রা' কবিতায় তিনি স্বয়ং নিজেকেই সম্বোধন করেছেন—এবং প্রায় চীনে কবিতার ধরনে বা পাউণ্ডের কোনো-কোনো ছোটো কবিতার মতো তাঁর এই

*Life of a Man: Giuseppe Ungaretti, a version with an introduction by Allen Mandelbaum Hamish Hamilton, London and New Direction, New York. Bilingual.

কবিতাগুলিতে তুলির ছোটো-ছোটো টানের পর অনেকটা জায়গা যেন নির্বিবেক খালি প'ড়ে থাকে। কিন্তু চীনে কবিতা সাধারণত যেমন একটি অপরিমিত আলস্য এবং মধুর অবসাদে শেষ হয়, উনগারেত্তির কবিতাপাঠের অনুভূতি সর্বত্র এ-রকম নয়। বরং যা উদ্দীপ্ত করে, চকিত করে—এমন উপকরণই বেশি।

উনগারেত্তির কোনো-কোনো কবিতার আকার লক্ষ্য ক'রে চমকে উঠতে হয়। দু'লাইন, তিন লাইন, কখনো-কখনো এক লাইনের কবিতা। 'I illumine me / with immensity'—একটি সম্পূর্ণ কবিতা ; 'Of other floods I hear a dove'—অন্য একটি কবিতা, এবং এ-ধরনের উদাহরণ এখানেই শেষ নয়। প্রথম চোখে পড়বার মতো বৈশিষ্ট্য তাঁর কোনো-কোনো কবিতার এই আকারহ্রস্বতা হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর ভালো কবিতাগুলো, সৌভাগ্যত, দীর্ঘতর। কবিতাকে সংহত, সংযত, এবং ইঙ্গিতময় করবার দিকে আমরা উৎসাহী, কিন্তু এই দু'লাইন এক লাইনের এপিগ্রামকে ঠিক কবিতা বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশেষত, উনগারেত্তির কোনো কবিতা যখন মন্তব্যেই শেষ হয়েছে। 'Of other floods I hear a dove'—বাইবেল, এবং বাইবেলীয় পুরাণের ওপর একটি মন্তব্য। সুন্দর, কিন্তু একে কবিতা বলবো কেন ?

আলোচ্য গ্রন্থে বাইবেলের ঘটনার উল্লেখ আছে, শেষ অংশে প্রায় সমগ্র 'ঈনিড' প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ভূমিকা লেখক আলেন ম্যাণ্ডেলবম এ-বিষয়ে গুরুগম্ভীর মন্তব্যও করেছেন। উনগারেত্তির কবিতা হয়তো স্থানে-স্থানে দুর্বোধ্য, তৎসত্ত্বেও এ-কথা বলা যাবে না যে তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতার কারণ কোনো গোপন উল্লেখ, বা লুক্কায়িত শাস্ত্র। কবিতা দুর্বোধ হয় সাধারণত দুটি কারণে। এক, যখন কবির কোনো স্বতন্ত্র নিয়মাবদ্ধ জগৎ লুকিয়ে থাকে কবিতাটিতে, যেখানে অর্থোদ্ধারের একটি চাবি সংগ্রহ না-করলে আমাদের হোঁচট খাবার আশঙ্কা পদে-পদে। যেমন, ইংরেজি ভাষার মেটাফিজিকাল কবিতা। আবার, এমনও হ'তে আরে, কবিতাগুলি

দেখতে-শুনতে অত্যন্ত সরল, কোনো আগে-থেকে-ভেবে-নেয়া নিয়মের জগৎ নেই সেখানে যেজন্যে কোনো চাবি খুঁজে নিতে হবে, অথচ কিছুতেই—অন্তত বার-বার না-পড়ার আগে—যার অর্থ ধরা দিতে চায় না। যদি প্রথম শ্রেণীকে অর্থগত দুর্বোধ্যতা বলা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীকে কী বলবো ? অনুভূতিগত দুর্বোধ্যতা ? ধর্মশাস্ত্র, এবং ক্লাসিকাল সাহিতের ইতস্তত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উনগারেত্তির কবিতার দুর্বোধ্যতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

'খুব অল্প জরে মসৃণ, এ-রকম কাচ যেন রাখালের হাত দুটি' (দ্বীপ), বা 'ক্লান্ত এক ভুরুর মতো রাত ফিরছে মুঠোর গর্তে' (প্রতিটি ধূসর)—এ-ধরনের পংক্তিকে সুবোধ্য বলবার কোনো উপায় নেই, এবং এই পংক্তির ব্যাখ্যা কোনো শাস্ত্রৈষণার দ্বারা সম্ভব নয়। এই উপমার লক্ষ্য আমাদের অনুভূতি।

উপমারও প্রকৃতি আগাগোড়া এক রকম থাকেনি। প্রথম দিকের উপমার ইম্প্রেশনিজম, ও আর্দ্রতা কেটে গিয়ে যেন ক্রমশ শক্ত, কঠিন এক পৃথিবী উন্মোচিত হয়েছে তাঁর শেষ দিকের কবিতায়। কবিতাগুলো প'ড়ে মনে হয় তিনি যেন খোদাই ক'রে-ক'রে লিখছেন, এবং সমস্ত কবিতার একটা শক্ত, পাথুরে ভাব এমনভাবে জায়গা জুড়ে থাকে যে কোনো-কোনো পংক্তিকে স্থানে-স্থানে গুরুভার মনে হয়। 'মাটি', 'পাথর'—এই স্পর্শসহ পদার্থগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান নিয়েছে তাঁর কবিতায়, এবং স্পর্শসহ কাঠিন্যের প্রতি উনগারেত্তির ঝোঁক কখনো রিলকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের, কখনো বা সেজানের। এবং, সমস্ত বইটা শেষ ক'রে উঠে শুধু মনে হয় যে, এখানে এমন একজন কবির সন্ধান পাওয়া গেলো যিনি প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহার করতে বহুবার চিন্তা করেছেন, এবং 'Between one flower gathered and the other given the inexpressible Null' ('চিরন্তন') কবিতাটি তাঁর প্রত্যেক কবিতাতেই একটু-একটু ক'রে আছে, অর্থাৎ সেই শব্দটি আছে, যেটি ঈশ্বরদত্ত, অমোঘ, নির্মল, এবং অন্যটি—যাকে কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ক্রোচে-কথিত 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা', যা সব-কিছুকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে একটি উজ্জ্বলতায় উপস্থিত হ'তে চায়, উনগারেত্তির কবিতায় তা দেখতে

পাইনি বললে ভুল হবে। বস্তুত, 'জাহাজডুবির পর একটি ছিটকে-আসা নেকড়ে', 'হাওয়ায় গুল্ফিত পাথরগুলোর ওপর চিতাবাঘের মতো তুমি', 'জলন্ত নীরবতার মতো প্রেম,' 'আগুন-চোখের সেই নেকড়ে যা একটি বোঁটার মতো সমস্ত নগ্ন নির্জনকে ধ'রে রাখে,' অর্থাৎ—উনগারেত্তির উপমার সমস্ত সংসার যেন বিশেষ একভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা, একবার, এক মুহূর্তে তাদের যথাস্থানে দেখতে পেলাম।

এই সংকলনে উনগারেত্তির চারটি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রথম গ্রন্থের নাম 'আনন্দ', দ্বিতীয়টির—'সময়ের চেতনা বা বেদনা', তৃতীয়টির—'বিষাদ', শেষ গ্রন্থটির নাম—'প্রতিশ্রুত দেশ', এবং সংকলনটির নাম, 'একটি মানুষের জীবন'। সার্থকনামা। শেষ গ্রন্থটির 'কোরাস···' এবং অন্যান্য কবিতা সত্যিই তাৎপর্যময়। ঈনিস, যিনি সুন্দর, এবং ঈপ্সিত দেশের স্বপ্নই যাঁকে চিরকাল উৎসাহ জুগিয়ে চলে—উনগারেত্তির শেষ দিকের কবিতায় তিনি একজন প্রধান প্রতীক। উনগারেত্তিও বিশুদ্ধতমের স্বপ্ন দেখেন, শব্দগুলোকে ছাঁকতে-ছাঁকতে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যান—যার পরে শুধু অপেক্ষা করে—

'Gleam unseen of the dazzled
Spaces where the stars
Pass immemorable life
Wild with the weight of solitude.'

বইখানার অনুবাদক মার্কিন, মুদ্রাকর ইতালিয়ান, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইতালিতে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় উনগারেত্তি এই প্রথম অধিগম্য হলেন, এবং যদিও কিছু দেরি হ'লো, অনুবাদক ও প্রকাশক ব্যাপারে ভাগ্য তাঁর সহায় হয়েছে। অনুবাদে কোথাও আড়ষ্টতা নেই, কোনো-কোনো কবিতা প'ড়ে মনে হয় তা ইংরেজি ভাষারই আধুনিক কবিতা। বইখানা পেপ্যার-ব্যাকে বের করার জন্য আমরা প্রকাশককে অনুরোধ জানাই।

পাস্‌টেরনাক-এর প্রসঙ্গে

অমিয় চক্রবর্তী

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র]

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পাওয়ামাত্র পেপার-ব্যাকগুলি অর্ডার দিয়েছিলাম। সব বই এসেছে; একত্র কাল রওনা ক'রে দেব। সামান্য উপহারস্বরূপ আপনাকে কিছু সদ্যপ্রকাশিত বা অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠিয়েছি। আপনি গ্রহণ করবেন। সঙ্গে রইল পাস্টেরনাক-এর "আত্মজীবনী" সংবলিত ক্ষুদ্র রচনাসংগ্রহ।

পাস্টেরনাক-এর গদ্যসংকলনে পেলাম উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। হয়তো বইটা আপনি পূর্বেই পড়েছেন। ভ্রামণিক চিত্র ভোলবার নয়—যেমন ভেনিসের অনুভব-দৃশ্য—সব সুদ্ধ বড়ো আশ্চর্য এবং যথার্থ। শুধু ভাব নয়, আবির্ভাব। আশির কাছে বিশিষ্ট একটি মনের নিভৃত বার্তার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে বাহিরের সূক্ষ্ম চলচ্ছবি। ধরনটা মনে করিয়ে দেয় Kafka বা Rilke-র একটা দিক। যেখানে তাঁরা ডুব-সাঁতারি। ডাঙার ঘটনা জলের তল থেকে দেখেন অথচ অবতরঙ্গে মেলানো পটে খুঁটিনাটি বাস্তবের ভিড়। কখনো যে সরাসরি রাস্তাঘাটের সংবাদ ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্তু সলিল থেকে ওঠা চুল-চেরা ক্যামেরার দলিল এঁরা পেশ করেন প্রতিভার বিকল্পে। কথাবার্তা কখনো ঘনধারা, এবং জরুরি; কখনো জড়োয়া মেঘে অন্তর্হিত; আকাশের পরিচয়ে তাদের উদ্দেশ্যবিচার সম্ভব, বক্তব্য হিসাবে ততটা নয়। পাস্টেরনাক্‌ও বিচিত্র ভঙ্গীর অনুসারে ভোগ্য, ভাব্য, স্পর্শিত বা দর্শনীয়কে তুলির টানে ঐক্য দিয়েছেন, মন-কেমনের প্রেক্ষিতে তাদের গূঢ় সত্তা ধরা পড়ে, কখনো পড়ে না। স্মৃতির সুতো অদ্ভুত, যা হয়নি তাও যেন বাঁধা হল; যা ছিল বা আছে তার পারম্পর্য খুঁজতে হবে শিল্পীর দারুণ ইচ্ছায়, কালের বাহিরে। আগন্তুকের চুলে বা কণ্ঠের ধ্বনিতে প্রমাণিত হল বিদীর্ণ ভুলে-যাওয়া সংকট, কেউ জানে না ঠিক কী হল, লেখকও নয়, কিন্তু স্বীকৃত হল

নির্ঘাত সত্য। গল্পের ধারা বইছে ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে নয়, মর্জির সমন্বয়ে। মধ্যে যদি জোর তুষার প'ড়ে থাকে তাহ'লে বাড়ির বা রাস্তার নাম ঠিকানা পর্যন্ত আদৌ বদ্‌লে যাবে, হয়তো রঙের বদল বেদনার চেয়ে বড়ো পরিবর্তন, ঐ শহরে থাকা সইল না। অথচ তলে-তলে যেন যুক্তির চেয়ে বড়ো যুক্তি ক্রিয়াশীল, অনিবার্য হ'য়ে দেখা দেয়, হয়তো প্রতীক হ'য়ে। মার্বুর্গে অধ্যয়ন-কালে পাস্টেরনাক্ জর্মান দর্শনের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, অথচ সরকারিভাবে Existentialismএর পশ্চিমী অস্তীতি-তত্ত্ব দেখা দেবার পূর্বেই তাঁর লেখায় ছুঁয়েছিল আধুনিক জর্মান এবং ফরাসী শিল্পদর্শনের প্রাথমিকতা।

বই থেকে নেয়া, বা কাল্পনিক আরো উদাহরণ। ন্যায়ের যুক্তি পাখা মেলে উড়ে গেছে, মুক্তি ঠেকল ভিনটে নোনা লাল ফলে, গাছের তলায় ছড়ানো। এরা আছে, এই। ভালো ক'রে ঠাহর হলে মন যে কোনো-কিছুতে যুক্ত হয়, তাতেই সম্বন্ধের তৃপ্তি উছলিয়ে ওঠে। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের বিখ্যাত জল দেখলেন রুষীয় কবি, প্রাচীন মলিন অথচ তার মসৃণ প্রবাহ সন্ধ্যায় জ্ব'লে উঠল ইতালির তারা, ধরা দিল গণ্ডোলার বিহ্বল ফোটোগ্রাফ। কত যুগের মহান সভ্যতা প্রক্ষিপ্ত কোনো একটি মুহূর্তকে অবলম্বন ক'রে দৈবে দেখা দেয়, এবং বিশেষ নির্ভর যেন এই দূরাগত কবির চোখে। যা মনে হয় আকস্মিক, বা অকিঞ্চিৎকর তারই উপরে পাস্টেরনাক-এর ঝোঁক; তিনি উদ্ধার পেয়েছেন হঠাৎ সংলগ্নতায়। ঝর্নার শব্দ বা স্রোত তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু, সাংঘাতিক অবস্থায় তাঁকে বহুবার আশ্রয় দিয়েছে (স্বজীবনীতে; ডাক্তার জিভাগো উপন্যাসে); মর্মরজালে বেঁধেছে চুরমার অথবা ঠিকরে-পড়া বর্তমানকে। না-হ'লে ট্রেনযাত্রীর মহাদুঃখ, অন্যমনস্ক বড়ো-বড়ো গাছ, রক্ষা করা যেত না। খিদের গেলাস, চিরুনি, পুঁটুলি-ভরা বাসনার উদ্বেগ অতীতের ঝড়ে অথবা নব্য প্রলয়ে তছনছ হ'য়ে চৈতন্যে হারাতো। অনির্দেশ সন্ধান আছে প্ল্যাটফর্মের পাশে দরিদ্রা দোকানি-মেয়েদের চীজ্ বা সসেজ্ বিক্রির আশায়, যার প্রান্তে ঘন অরণ্য। যুদ্ধের অশ্লীলতায় বা সামরিক ক্রেতার জন্তু-বাক্যে ও ব্যবহারে প্ল্যাটফর্মের কোণে সেই কেনা-বেচার

অপমৃত্যু ঘটল না। তার একটা কারণ তখনো ঝর্নার ধ্বনিতে একটি দিন জেগে আছে।

বলা বাহুল্য, এই দিকটাই শিল্পী পাস্টেরনাক-এর সম্পূর্ণ প্রাক্-জিভাগো পরিচয় নয়, কিন্তু তাঁর অনেকখানি মিল নব্বুইয়ে-পাওয়া (এবং কিছু আধুনিক) পশ্চিম-য়ুরোপের সঙ্গে। সেই য়ুরোপ যা গভীর, অথচ অত্যন্ত ডুবে-যাওয়া; যা স্নায়ুর ভারে আচ্ছন্ন অথচ শিল্পে যার পরিচ্ছন্ন মূর্তির অভাব নেই; যেখানে যুগ-সন্ধির চেয়ে যুগ-সন্ধ্যার প্রাদুর্ভাব।

মাত্রা নিয়ে কথা। বোঝা যায় এই ধরনের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক লেখকের পক্ষে উৎকেন্দ্রিক হবার বাধা কম। ভাগ্যক্রমে রাশিয়ায় এঁর জন্ম, প্যারিসের গলিতে নয়; তাই সাইবেরিয়ার দিগন্ত-জোড়া টুন্‌ড্রা, জনসংঘের দোল এঁর পৃষ্ঠায় হঠাৎ অবতীর্ণ হয়। টলস্টয় টুর্গেনিভের ইনি সগোত্র তাও বোঝা যায়, কিন্তু কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত ইনি ভয়ার্ত; শুধু বহির্গত কারণে নয়, আত্মস্বভাবের বশে।

কোথায় যেন দুই জগতের মিল ঘটেনি এই যুগশেষ-বিলাসীদের শিল্পে। যা উজ্জ্বল অথচ প্রাচীন, যা আগামী অথচ সূর্যসম্ভাবী তার সংগম যেন এঁরা চৈতন্যের সাধনায় জানেন নি। হয়তো সংকীর্ণ অর্থে চৈতন্যসাধন—কেবলমাত্র যা মনস্তাত্ত্বিক, বা সৌন্দর্যপিপাসায় অবসরহীন—মানুষের পূর্ণ দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের প্রতিভা অন্যতর। অনুভূতির সূক্ষ্মতম তারে কবি কালিদাস বা শেলি ধরেছিলেন অপরাজেয় মানবচিত্তের ভবিষ্যৎ। দুঃসাধ্য জাতীয়, অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়-পারগামী উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনো গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না। তর্জমায় কবিতার বিচার হয় না, তাই তাঁর কাব্যের প্রসঙ্গ এখানে বহির্গত। কিন্তু তাঁর নতুন বা পুরোনো গদ্যের ঝলমলে পরিচয়ে আজ পর্যন্ত চারিত্রের ঔদার্য প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দেয়নি অনাগত, বা সমাগতের বৃহৎ জগতে। যেখানে দগ্ধ বাসনা, আত্ম-রতি বা বিরতির চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের অধিকারী মানুষ পথ খুঁজছে, সেই মানুষের শিল্প-নির্ভর অন্যত্র। প্রাত্যহিক আলো এমনকি

ধুলোর সংসারে আছে সেই অন্নজল, যা নিরন্ত আত্ম-জর্জর হৃদ্‌গত সাহিত্য দুর্লভ্য।

বিশ্বপ্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে প্রাণের আয়তনে সম্পৃক্ত, অথচ বিপুল অপার তৃণতম থেকে সৌরতর সেই প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যের অনেকখানি মূলধন সেখানে। কিন্তু ইতিহাসের তুমুল বিবর্তনে কে'টি আগ্রহের প্রকাশরূপী নাট্যে পর্বে-পর্বে যে জনানীর যাত্রা খুলে যাচ্ছে, তাও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। সেখানেও কখনো প্রতিহত স্ববিরোধী, কখনো দ্রুত অভিযানী জনস্রোতে সাহিত্যের মহাধন খুঁজে নিতে হয়। শিল্পী এই ত্যাগের বীর্যের ঐতিহাসিক মানবিকতাকে অস্বীকার করলে অনেকখানি বঞ্চিত হন; পাস্টেরনাক-এর মতো শ্রেষ্ঠ লেখক এই স্বনির্বাসন মেনে নেবেন তা মনে করা যায় না। যদি জবাবদিহি আসে কোনো রাষ্ট্রিক ঘটনার যোগে তাহ'লে বোঝা যাবে শিল্পর দিক থেকে পুরো উত্তর দেওয়া হল না।

বুঝতে পারছেন "ডাক্তার জিভাগো"র প্রসঙ্গ এড়াতে পারিনি। শৈল্পিক বিবিধ অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও এত মহান শক্তিশালী রচনা যে-কোনো যুগেই আন্দোলন তুলত। কিন্তু এই অর্ধ-পোলিটিকার নোবেল-প্রাইজের যুগে (যেখানে জেনারেল মার্শাল শান্তির বক্‌শিস পান, মহাত্মা গান্ধীর নাম পর্যন্ত ওঠে না) পাস্টের্নাক বিপর্যস্ত হলেন উভয় পক্ষের মল্লদের হাতে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রুক্ষেরা তাঁর নামকে টেনেছে বারুদ-ভরা বাক্যের মিথ্যায়। কোনো পক্ষেরই জিৎ হবে না ঐ বইয়ের জোরে। কারণ যদিও তিনি রুশ বিপ্লবের দাহ-চিত্র এঁকেছেন—শাদা-লাল কাকেও সমর্থন না-ক'রে—শেষ পর্যন্ত তাঁর শিল্প নিভৃতচারী, এমনকি সংকুচিত; ধীর নৈঃশব্দ্যে তাঁকে শোনা যায়। অবাক কাণ্ড এই যে সুচারু শিল্পীকে নিয়ে ঘনিয়ে উঠল অব্যবসায়ীদের ঝড়। যাঁরা লেখক বা রুচিশীল পাঠক তাঁরা এই বাগ্‌-যুদ্ধে বিরত হ'লে ভালো করতেন, এখন উপায় নেই। কৌতুকের বিষয় এই যে নানা দেশে রেডিও এবং হলদে-কাগজি পত্রিকায় যাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য বিতরণ করছেন তাঁরা কৃষ্ণের ব্যাখ্যায়

ক-উচ্চারণ জানেন না, জিহ্বাগ্রে জিভাগো তাঁদের কাছে নামমাত্র, কিংবা কলহের উদ্যত চিহ্ন।

বইখানি আদ্যোপান্ত ভালো ক'রে প'ড়ে দেখেছি। যথাযথ আলোচনা পত্রে অসাধ্য, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় কোনো আধুনিক বইয়ের প্রতিক্রিয়া হৃদয়ে এত আঘাত, এত অনির্বচনীয় ধন্যতা, এত নৈরাশ্য এবং ক্ষোভ একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলবে ভাবিনি—শুধু সেইটুকু বলতে চাই। আমার ধারণা বইখানির বিশ্বজোড়া ফল মোটের উপর সোভিয়েটের সপক্ষেই মর্যাদা বাড়াবে, যদিও ঠিক বলতে পারি না। তার একটা কারণ এই যে গল্পের সব চেয়ে প্রচ্ছন্ন অথচ স্মরণীয় পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান বোধ হয় স্ট্রেল্‌নিখভ। অথচ তিনি সোভিয়েট কর্মী। তাঁর স্বভাবজাত কঠিন বীর্য হঠাৎ জ'লে উঠল চরম ত্যাগের মহিমায়, যদিও তারও চেয়ে মহিমার জন্য চাই বাঁচবার কল্যাণসাধনা। তুলনায় ডাক্তার জিভাগোকে অতি বাক্যশীল এবং বিলুব্ধ মননজীবী ব'লে ভ্রম করা পাঠকের পক্ষে আশ্চর্য নয়। মনে পড়ছে স্ট্রেল্‌নিখভের শেষ জীবনরাত্রি। অবিস্মরণীয় লারিসা-র সম্পর্কে দুই পুরুষকেই শিল্পী উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, কিন্তু নতুন কালের উদ্যোগী বীরের প্রতি মানুষের বেশি আকর্ষণ, বিশেষ ক'রে যখন তা অপ্রত্যাশিত ক্ষমা এবং করুণায় দেখা দেয়। লারিসা-র চোখে স্ট্রেল্‌নিখভের মূর্তি চিরদিনের মতো সাহিত্যে আঁকা রইল।

পাস্টেরনাক-এর সৃষ্টিশীল মনকে জিভাগোর সঙ্গে একীভূত করা সুবিচার নয়; কিন্তু মূলত এই আত্ম-বিভক্ত, জটিল, স্ববিলাসী ডাক্তারকে তিনি বড়ো জায়গা দিয়েছেন। সেই জায়গা আমরাও দিতে রাজি, কিন্তু যদৃচ্ছাচারী অসম জীবনের অন্য নানা দিক আমরা লক্ষ্য না-ক'রে পারি না। মারিনা-র প্রতি বৃদ্ধ জিভাগোর ব্যবহার ধিক্কারের যোগ্য বললে কম বলা হয়। কতকগুলো পুরোনো মতামত লেখবার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে এই লেখকবীর ডাক্তার সংসারকে পায়ে মাড়িয়ে যাবেন, অথচ লোকেরা যশোগান করবে এমনটা আশা করা যায় না। বায়রনী বৃত্তিকে আর্টের মূল্যে আজ কেউ বেচতে গেলে ব্যর্থ হবেন, এমনকি স্বয়ং পাস্টেরনাক-ও। জানি, জিভাগোর ঐ অবস্থা

তার পতনের চিহ্ন ব'লেই আঁকা হয়েছে এবং এক পক্ষের সমালোচকেরা খুশি হ'য়ে ঘোষণা করছেন এই পতনের (এবং বিশ্বজোড়া যত কিছু পাপের) একমাত্র কারণ বিশেষ একটি রাষ্ট্র। কিন্তু এই ধরনের যুক্তিকে গ্রাহ্য করতে নেই। আর্টের সঙ্গে সমগ্র মানুষের এবং সমাজের যে-যোগসূত্র আছে তার উজ্জ্বলতর পরিচয় পাস্টেরনাক কোনোদিন লেখায় ব্যক্ত করবেন আশা রইল।

পলিটিক্সের দিক থেকেও পাঠকমাত্রই বুঝবেন অন্ধ বিপ্লবই রুষ আন্দোলনের বা অন্য কোনো জাতীয় আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কল্যাণে বিজ্ঞানে শিল্পে মানুষ এগিয়ে গেছে, বিপ্লবকালের এবং পরবর্তী কালের শত-শত অবর্ণনীয় অমার্জনীয় পাপ সত্ত্বেও। আবার বলি, অমার্জনীয়, কেননা কোনো উদ্দেশ্যেই বিভীষিকা অত্যাচার বর্বরতা আমরা মানি না। কিন্তু এই ব্যাপার একটি কোনো দেশের স্কন্ধে চাপিয়ে আমরা উদ্ধার পাবো না। পাস্টেরনাক-এর ঠিক সেই ইচ্ছা ছিল না, যা তিনি নিজের জীবনের বিশেষ ঘের দিয়ে জেনেছেন তাই নিয়েই লেখা তাঁর বই। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপকতর জ্ঞান কোথাও ফুটিয়ে তুললে তিনি ভালো করতেন। ফরাসী বিপ্লবে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা এশিয়ার বহু "ধর্মযুদ্ধে" পাপের রক্তবন্যা ব'য়ে গেছে। পাস্টেরনাক-এর বুলি বজ্র হ'য়ে সকল বর্বরতাকে বিদ্ধ করলে নানা পক্ষ হ'তে ঘোর আপত্তি উঠত জানি—হয়তো দেশে দেশে তাঁকে ধিক্কৃত স্থান দিত—কিন্তু স্বাধীন সাহিত্যবিচারের পক্ষ হ'তে আমরা আপত্তি জানাবার দলে নই। আমরা অর্থে ভারতীয় নয়, সকল দেশের সেই আমরা, যারা এখনো রাষ্ট্রিক আধিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হারাই নি। এই সব তীব্র প্রসঙ্গে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, বহুজনীন সমাজের অন্য আরেকটা দিক উদ্ঘাটিত হ'লে জিভাগো-গ্রন্থের মর্যাদা বাড়ত। আপন দেশের উল্লেখে সেই অপরাজেয় কল্যাণশক্তির নূতন পরিচয় জানালে ক্ষতি কি? নৃশংসতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত অস্বাধীনতার বিরুদ্ধে বর্ষিত শিল্পবাক্য কোনো তথ্যের স্বীকারে দুর্বল হ'ত না, প্রবলতর হ'ত, কেননা "সার্বিক রাষ্ট্র"-যন্ত্রের ফাটলে কোথাও একটু মনুষ্যত্ব মাথা তুলেছে, সেই মনুষ্যত্ব থেকে নেই ছড়িয়ে যাচ্ছে এই কথা বলার দ্বারা অসত্য বা অন্যায়ের সমর্থন করা

হয় না। এই সহজ সত্যটি মহা প্রতিভার আলোয় দৃপ্ত হ'য়ে ওঠেনি ব'লে পাস্টেরনাক-এর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনও ক্ষুণ্ণ হয়।

খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে ডাক্তার জিভাগোর ব্যবহার অতি বিচিত্র। চরিত্র বা আচরণের ক্ষেত্রে ন্যু টেস্টামেণ্ট কেবল আপ্তবাক্যের মতো শূন্যে ঝুলে আছে, বারংবার শ্লোকোচ্চারণ চলেছে কিন্তু একান্ত স্বার্থপরতা, দুর্বল মননের ক্রিয়াকাণ্ড তারই ছায়ায় লালিত হল, যেমন শুনেছি জুয়ো-খেলার সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতী প্রার্থনাচক্র আবর্তিত হ'ত। মোক্ষের এই উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চিমী ধার্মিক অনায়াসে গ্রহণ করেছেন, জিভাগোর খৃষ্টধার্মিকতার উপর কত ভজন উপদেশ আমরা শুনলাম তার ঠিক নেই—অথচ যথার্থ খৃষ্ট-ধর্মীদের কথা আলাদা। তাঁরা ঠাণ্ডা-গরম কোনো হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে নন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই শুভ্রতা বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই ছড়ানো। কিন্তু খবরের কাগজে সেই খবর নেই কেন। যতদূর মনে পড়ছে ভারতবর্ষের কোনো কাগজে জিভাগো গ্রন্থ বিষয়ে পশ্চিমের প্রতিধ্বনি বা তারই সমধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি। আমার দূর কানে ঠিক আওয়াজ মাতৃভূমি থেকে এসে পৌছয়নি, এই আশ্বাস চিঠিতে ব্যক্ত করি।

হাওয়াই-ডাকের দীর্ঘ পত্রে হু-হু ক'রে যা-কিছু শিখে ফেললাম তা বইয়ের আসল মর্মকে বাদ দিয়ে রচিত। স্তব্ধ হ'য়ে যাই যখন লারিসার কথা ভাবি। জিভাগোর জীবনের উচ্চ শিখরে-শিখরে যে-আগুন আলো হ'য়ে উঠল, নত হ'য়ে উন্নত হ'য়ে তাকে পাঠকের নমস্কার জানাই। অন্য কোনো চিঠিতে হয়তো সেই চিরন্তন দীপ্তির পরিচয়ক্ষেত্রে নামব, যেখানে পাস্টেরনাক-এর রচনা মৃত্যুহীন। জিভাগোর মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত পরমুহূর্তে সেই অমরতা দেখতে পাই। লারিসার কয়েকটি কথায় শিল্পের মন্ত্রোচ্চারণ হল, জীবনে যার শেষ নেই। তার পরে তার নিজের নামহীন অনির্দেশ এবং মৃত্যুর সম্ভবপর ঘটনা যেন মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে। যেখানে পাস্টেরনাক আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন শিল্প সেই অঙ্গনের চতুর্দিকে, তার তলে, তার ঊর্ধ্বে।

জীবনে-জীবনে বিস্তৃত আলো দেখা গেল, হয় তা বহু গৃহদীপের, নয়তো আকাশের গ্রহমালার।

পাস্টেরনাক-এর কাব্যের প্রসঙ্গ তুলব না বলেছিলাম, যদিও ইংরিজি তর্জমার বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে যা দেখেছি তাতেও মুগ্ধ হয়েছি। জালি-কাজ-করা ছায়ায় আলোয়, কাচের ছাঁকনিতে উদ্ধৃত কতটুকু কী দেখেছি তা যাচাই করবার সাহস নেই। কিন্তু পাস্টেরনাক আসলে কবি। যদিও তাঁর গল্পে চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার আবহরচনার শক্তি অসামান্য, শেষ পর্যন্ত গদ্যেও যেখানে তিনি কবির যথার্থ অবসর পেয়েছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি জয়ী। তাঁর জয়লাভ সেখানে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে, হোক তা মানুষ, বা সংসার বা পৃথিবীর অন্য কোনো দান। এই অর্থে তিনি বলেছেন—

"The nameless ones are part of me
Children also, the trees, and stay-at-homes,
All these are victors over me—
And therein lies my sole victory."

বস্টন, ম্যাসাচুসেটস
১৮ ডিসেম্বর ৫৮

স্বপ্নেরও ভিতরে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নেরও ভিতরে ঘোরে সেই এক জটিল বেড়াল
তীক্ষ্ণ নখের ধার গোপনে যে চোরাই রেশমে
লুকিয়ে হঠাৎ আসে বর্ণচোরা চটুল আলোয়
যেখানে, আমার প্রাণে, সক্ষম তরীও কিনা টাল
সামলাতে না-পেরে ঘোরে রক্তে, স্রোতে : নির্বোধ নিয়মে
বিপজ্জনক স্মৃতি বারে-বারে ছিটোয় বিলয়।

ছিলা টান হ'য়ে ছিলো ; সে এসে, ছদ্মবেশে, দিলো
স্পন্দনে হিংস্রক স্বর, স্বেচ্ছাচারী রক্তে সুর, ফুল
ফুটে উঠলো অন্ধকারে, ন'ড়ে-ওঠা অলংকার কূল
ছাপিয়ে, উঠলো বেজে, আর মৃদু একরোখা আলো
অভিমানে ম'রে গেলো, যেহেতু নকল চাঁদমারি
লক্ষ্য ক'রে ছুটে গেলো ভ্রষ্ট তীর অস্থির দেমাকে :
যেন কোনো কুয়াশায় ঠিক পথ না-চিনে না-দেখে
যে-দেশে পৌঁছনো গেলো তারও রাজা বেড়াল, শিকারি।

সংসারী বৌদ্ধ

দীপক মজুমদার

আবার আশাবরী তোমার স্মৃতি
চিবুকে দাঁতে জিভে নেশা
বিলাসী আলো তার ক্ষমা ও প্রীতি
রাত্রি আবরণে মেশা।

দূরের হাঁসগুলি এখনো চ'লে যায়
বিদেশী সূর্যের চোখে
এ কোন উল্লাস! ওপাশে মৃত চাঁদ
ঝড়ের মন্দিরে ও কে!

ভুলেছি সব তবু দুই চোখে
প্রতিটি ছায়া কেন কাঁপে
আমারই পদপাত এই বুকে
শ্রাবক যৌবন যাপে।

বন্ধু, আমলিন জ্যোৎস্না
সেও তো স্বপ্নের ভাষা।
তোমার চুম্বনে লব্ধ
চিবুকে দাঁতে জিভে নেশা।

রাত্রি প্রবাসের তারাহীন
শূন্যে করুণার শিখা,
নীরব আশ্লেষে প্রতিদিন
জ্বলে কি প্রাজ্ঞের পাখা!

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।